পদার্থ বিজ্ঞানের খোশ খবর

পার্থসারথি চক্রবর্তী

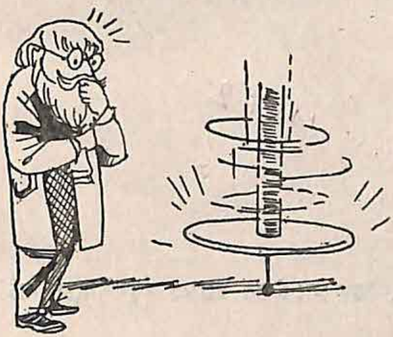


পদার্থ বিজ্ঞানের খোশখবর

4'8

৫০৫

পার্থসারথি চক্রবর্তী



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক ল কা তা ৯

প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ চতুর্থ মুদ্রণ মার্চ ১৯৮৭

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সঞ্জয় দে

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৮·০০

চৈতি, রাজা, অভিমন্যু, বাবুন, মিঠুন,
ঝুম্পা, অতুল, টিংকু, ডিংকু, মধুমিতা,
হাসুবানু, বাম্পা, বুবাই, লবু, কুশু
এবং আর আর যেসব ছেলেমেয়েরা
আমার লেখা পড়তে ভালবাসে।

পার্থসারথি চক্রবর্তী

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বিজ্ঞানের বই

কেমিক্যাল ম্যাজিক
চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজব কথা
রসায়নের ভেল্‌কি
ম্যাজিকের মতো মজা
তত সহজ ছিল না
মজার এক্সপেরিমেন্ট
বুদ্ধি নিয়ে দারুণ মজা

লিট্‌ল সায়েণ্টিস্ট ক্লাব ও ছোটমামা

ডিংকু, টিংকু, মৌ, বাবুন-মিঠুনদের ছোটমামা আজ জুরিখ থেকে কোলকাতায় এসেছেন। ছোটমামা খুব নাম-করা বিজ্ঞানী। সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ শহরে ই. টি. এইচ ল্যাবরেটরীতে উনি রিসার্চ করেন। ডিংকু-টিংকুদের সবারই খুব ইচ্ছে ওরাও বড় হয়ে ছোটমামার সঙ্গে বিদেশে কাজ করবে।

এই ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের একটা সায়েন্স ক্লাব আছে। ছাদের উপরের ঘরে চলে তাদের নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। ছাদে ঢুকতেই একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়বে—'লিট্‌ল সায়েণ্টিস্ট ক্লাব'। ছু' পাশে ছুটো ছোট্ট ল্যাবরেটরী। কি নেই সেখানে? ইঁছুর, আরশোলা, গিনিপিগ, কাঠবেড়ালী থেকে শুরু করে নাইট্রিক এ্যাসিড, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, ছোট বড় কতসব ইলেকট্রিক বোর্ড, ট্রানজিসটর, চুম্বক, টবে নানা ধরনের গাছপালা সবই তোমরা দেখতে পাবে সেখানে।

ছুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ছোটমামাকে নিয়ে ওরা ছাদের ল্যাবরেটরীতে গিয়ে ঢুকল। ডিংকু প্রস্তাব করল: আজকের লিট্‌ল সায়েণ্টিস্ট ক্লাবের এই অধিবেশনে আমরা ছোটমামাকে সভাপতি হতে অনুরোধ করছি।

বাবুন বলল—আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলাম।

এরপর মিঠুন সায়েন্স ক্লাবের গত ছ'মাসের কার্যবিবরণী পাঠ করল। এর মধ্যে অবশ্য মিস কুটুস (ওদের ল্যাবরেটরীর ইঁছুর) যে বাপ্পাকে কামড়ে দিয়েছিল তার কথাও বাদ গেল না। কি কি নতুন বৈজ্ঞানিক মডেল তারা ক্লাবে তৈরী করেছে সেকথাও মিঠুন সকলকে শোনাল। সামনের মাসে এই বিজ্ঞান ক্লাবের সবাইকে নিয়ে মেজকাকু যে পুরী যাবেন

সগর্বে সেটাও ওরা ঘোষণা করল।

মিঠুনের কার্যবিবরণীর পর অতুল বলল—এইবার আমরা সভাপতিকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করছি।

ছোটমামা বললেন—আমি তোমাদের সকলের বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত উৎসাহ দেখে খুবই খুশী হয়েছি। তবে আমি সভাপতির মতো বক্তৃতা দিতে জানি না। আমি তোমাদের কিছু প্রশ্ন করব আজ।

ছোটর দল চোখ বড় বড় করে এ-ওর দিকে তাকাচ্ছে এমন সময় ছোটমামা জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা বিজ্ঞান নিয়ে তোমরা এত মাথা ঘামাচ্ছ, বিজ্ঞান কি তা বল তো শুনি!

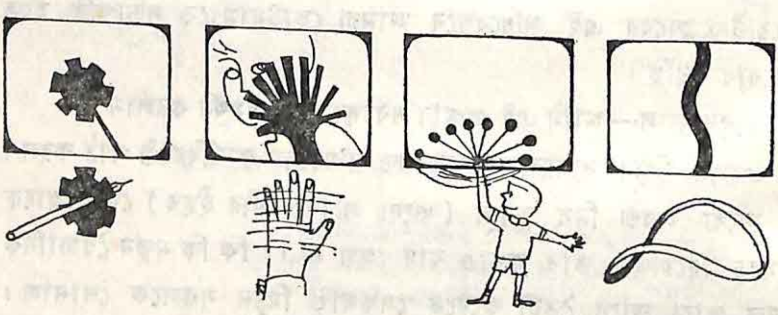
ডিংকু বলল—বিশেষ ভাবে যে জ্ঞান আমরা পাই তাই হচ্ছে বিজ্ঞান।

বাবুন বলল—এক্সপেরিমেণ্ট করে যা জানা যায় তাই হল বিজ্ঞান।

মিঠুন বলল—নতুন কিছু আবিষ্কার করাই হচ্ছে বিজ্ঞান।

ওদের মধ্যে বয়সে সব চাইতে ছোট হল টিংকু। সে বলল—যা আমরা বুঝতে পারি না—তাই হচ্ছে বিজ্ঞান।

ছোটমামা সস্নেহে ছোটদের সেদিন বিজ্ঞান জিনিষটা কি তা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ওরা—মানে লিট্‌ল সায়েন্টিস্ট ক্লাবের সদস্যরা ছোট-মামার ঐ কথাগুলো টেপ করে রেখেছিল। আমরা এখানে তা হুবহু তুলে দিলাম।



ছোটমামার কথা

জ্ঞান হচ্ছে জানা। তাই বিজ্ঞানকে বিশেষভাবে জানা বলা যেতে পারে।

কি জানা? প্রকৃতিকে জানা। জগতের যাবতীয় প্রাণবন্ত বা প্রাণহীন সব কিছুকে জানা।

সাধারণভাবে জানা আর বিশেষভাবে জানার মধ্যে পার্থক্য আছে। আমরা আমাদের চোখ, কান, নাক, জিহ্বা প্রভৃতি 'পঞ্চেন্দ্রিয়' দিয়ে যা জানতে পারি, সেটা সাধারণ জানা। বিজ্ঞান তারও গভীরে যায়। অজানাকে বিজ্ঞান আবিষ্কার করে।

আমাদের মনে যখন কি, কেন, কেমন করে এইসব প্রশ্ন জাগে, তখন বিজ্ঞান আমাদের পথ দেখিয়ে দেয়। তার থেকেই আমরা বিশেষভাবে কিছু জানি।

বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে সত্যকে জানা, প্রকৃতির রহস্যকে উন্মোচন করা।

কি করে সেটা সম্ভব হয়? পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুমান, কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় প্রভৃতির সাহায্যে প্রকৃত সত্যকে ধরা যায়।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্।

আদিমকালের মানুষ আগুনকে চোখ দিয়ে দেখেছিল এবং স্পর্শ দিয়ে তার উত্তাপটা বুঝতে পেরেছিল। তারা ওটাকে জেনেছিল কিন্তু বিশেষ ভাবে জানতে পারেনি। তা যদি পারত, তাহলে আগুন দেখলে আদিম কালের মানুষ ভয়ে পালাত না।

কিন্তু কেন আগুন জ্বলে এই প্রশ্ন সেই আদিমকালের মানুষের মনে উদয় হয়েছিল নিশ্চয়। তারা পর্যবেক্ষণ করে দেখল, গভীর বনে কাঠে কাঠে ঘর্ষণের ফলে আগুন জ্বলে। সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বন-জঙ্গল।



তারা নিজেদের দুই হাতের তালু ঘর্ষণ করে দেখল, উত্তাপ হয়। এরপর তারা পরীক্ষা করে জানল শুক্‌নো কাঠের সঙ্গে আর একটা শুক্‌নো কাঠ জোরে ঘর্ষণ করলে তার থেকে আগুন বেরোয়। তারা কার্য-কারণ সম্বন্ধটা ধরতে পারল। আগুন জ্বলে ওঠে এই কার্যের আগে আছে একটা কার —সেটা হচ্ছে ঘর্ষণ। এইভাবে জানা থেকে তারা অজানা জ্ঞান লাভ করল —ঘর্ষণে উত্তাপ হয় এবং উত্তাপ থেকে জ্বলে ওঠে আগুন। পাথরের উপর পাথর দিয়ে ঘা মেরেও তারা দেখল, আগুনের ফুল্‌কি

বেরোয়। এবার তারা চকমকি পাথরের সাহায্যে আগুন জ্বালতে শিখল। এই শেখাটা হল মানুষের বাঁচবার পথে সব চাইতে বড় আবিষ্কার।

আদিমকালের মানুষ অবশ্য ঠিক কিভাবে আগুন জ্বালতে শিখেছিল তার কোন রেকর্ড নেই। ওটা অনুমান। এখনকার বিজ্ঞানীরা হলে ঐ ভাবেই ওটা আবিষ্কার করতেন। বিজ্ঞান ঠিক ঐ ভাবেই প্রকৃত সত্যকে জানতে, প্রকৃতির রহস্যকে বুঝতে এগিয়ে যায়।

আগেই বলেছি, প্রকৃতির সব কিছু জানা হচ্ছে বিজ্ঞানের কাজ। এইজন্য এই সব কিছুকে জড়িয়ে জ্ঞানকে 'প্রাকৃতিক দর্শন' (Natural Philosophy) বলা হত আগে। কিন্তু দেখা গেল, জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার অফুরন্ত এবং বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ণ। বিশ্বের এই জ্ঞানভাণ্ডারকে তাই বিশ্লেষণ করে পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় বিজ্ঞানকে আলাদা আলাদা করে শিক্ষা করা হয়।

অবশ্য আলাদা ভাবে শিক্ষা করলেও এগুলি কিন্তু পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। একটা বিদ্যা আর একটা বিদ্যার সঙ্গে জড়িত। যেমন, মনোবিজ্ঞান ও শারীর বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞান—এগুলি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত।

কি করে আমরা প্রকৃত সত্যকে লাভ করতে পারি ?

প্রথম কথা জানবার আগ্রহ। কি, কেন, কেমন করে—এইসব জানবার আগ্রহ থাকা চাই। এই আগ্রহ নিয়েই বিজ্ঞান এগিয়ে চলে।

গাছ থেকে ফল পড়ে মাটিতে। এটাকে অতি সাধারণ ঘটনা বলেই আমরা জানি। মনে করি, এ নিয়ে আমাদের ভাববার কিছু নেই।

কিন্তু নিউটন ভেবেছিলেন। তিনি ভাবলেন, ফলটা তো গাছে রয়েছে। তার উপর দিকেও ফাঁকা, নীচের দিকেও ফাঁকা অর্থাৎ শূন্য। তা হলে ফলটা উপরের দিকে না গিয়ে নীচের দিকে পড়ে কেন ? কিসের টানে সে মাটির দিকে নেমে আসে ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং তার থেকে জানা গেল

আরও অনেক কিছু অজানা খবর।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে প্রকৃতিকে জানতে আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারি। সেজন্য চাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুমান, এবং ঘটনার কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয়। এগুলির সাহায্যে জানা থেকে অজানা জ্ঞান লাভ করতে পারি আমরা।

নিরীক্ষা হচ্ছে পর্যবেক্ষণ। আকাশে নানা রকম মেঘ হয়। কোন মেঘে বৃষ্টি হয়, কোন মেঘে ঝড় হয়। ওগুলি আমরা পর্যবেক্ষণ করি। ঘরের মধ্যে ইচ্ছামতো মেঘ তৈরী করে দেখতে পারি না।

কিন্তু ল্যাবরেটরীতে বসে একটা কিছুর সঙ্গে আর একটা কিছু মিশিয়ে যা করি সেটা হচ্ছে পরীক্ষা। পরীক্ষা আমরা ইচ্ছামতো করতে পারি কিন্তু আকাশের বজ্র-বিদ্যুৎ বা অন্য কোন প্রাকৃতিক ঘটনাকে দরকার মতো আমরা নিজের ইচ্ছায় ঘটাতে পারি না।

বিজ্ঞান জানে, বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ম মেনে চলে। হঠাৎ কিছু হয় না। যা কিছু ঘটে, তার আগে থাকে একটা কারণ। সেই কারণকে খুঁজে বের করা বিজ্ঞানের কাজ।

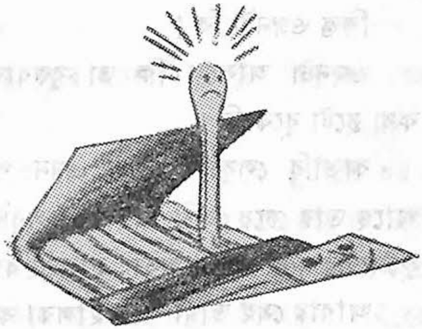
নিমন্ত্রণ বাড়ীতে ভোজ খেয়ে কিছু লোকের খুব অসুখ করল—কিছু লোকের করল না। যাদের অসুখ করল, তাদের কি কারণে অসুখটা করল খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল যারা দই খায়নি, তাদের অসুখ করেনি। অনুমান করা হল, দই খাওয়ার জন্যই তাহলে অসুখ করেছে। তখন অবশিষ্ট দই পরীক্ষা করে দেখা গেল, ওর মধ্যে বিষাক্ত জিনিষ পড়েছে। ওটা খারাপ।

পঞ্চেন্দ্রিয় ছাড়াও আর এক রকমে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারি। সেটা হচ্ছে মনের ব্যাপার। আমাদের মনের সুখ-দুঃখ আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু বুঝতে পারি। মন দিয়ে আমরা অনুমান করে নিই। কোথাও হৈচৈ হট্টগোল শুনলে আমরা অনুমান করি, মারামারি বেধেছে। ধোঁয়া দেখলে অনুমান করি, আগুন লেগেছে। অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা অনুমান করি। আকাশে ঘনঘটা মেঘ করে এলে

আমরা মনে করি ঝড়-বৃষ্টি হবে।

অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অনুমান করি বটে, কিন্তু অনুমান করলেই যে সেটা সঠিক হবে এমন নয়। যে অভিজ্ঞতায় সন্দেহ নেই, যেটা নির্ভুল এবং সব সময়েই সত্য, সেই অনুমানই হবে ঠিক।

বিজ্ঞানীর ভাষায় জটিলতা থাকবে না। যে কথার দুটো অর্থ হতে পারে এমন কথা বিজ্ঞানী ব্যবহার করবেন না। বিজ্ঞানী হবেন সংস্কারমুক্ত। হাঁচি, টিকটিকির বাধা বিজ্ঞানী মানে না। কারণ, এর মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই। টিকটিকির ডাকার সঙ্গে কারও যাত্রার কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই। সত্যকে জানাতে গিয়ে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে বিজ্ঞানীকে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, সূর্য ঘুরছে না, এই সত্য প্রচার করতে গিয়ে গ্যালিলিওকে জেলে যেতে হয়েছিল।



পদার্থের স্বরূপ

ডিংকুর ফুটবল নিয়ে মাঠে আসতে দেরি হচ্ছিল। এদিকে ঝণ্টু, মণ্টু, তাপু ওদের আর তর সইছিল না। ওরা গাছ থেকে বেশ বড় একটা বাতাবি লেবু পেড়ে এনে মাঠে নেমে গেল। ওটাই হল ওদের ফুটবল!

কিন্তু ফুটবল আর বাতাবি লেবু তো এক নয়। ওরা খুব জোরে লাথি মেরেও লেবুটাকে দূরে নিতে পারে না।

ডিংকু এল। ফুটবল নিয়ে নামল মাঠে। ওরা বলল, বাব্বা,

বাঁচলাম। ফুটবলটা কেমন জোর ছুটে যায়, আর বাতাবি লেবুটা কিছুতেই যেন নড়তে চায় না!

কেন চায় না?

বারে! লেবুটা যে ভারী আর ফুটবল কত হাল্কা!

'ভারী' আর 'হালকা' কথা দুটিতে ওজনের কথা চলে এল। লেবুটার ওজন বেশি আর ফুটবলের ওজন কম।

কিন্তু ওজনটা কি?

ওজনটা আসলে কি তা বুঝবার আগে এসো আমরা ঐ কম-বেশি কথা দুটো বুঝে নি।

বাতাবি লেবুটার মধ্যে এমন পদার্থ রয়েছে, যা ফুটবলের মধ্যে যা আছে তার চেয়ে বেশি ভারী! লেবুটা ভরাট পদার্থ দিয়ে বোঝাই আর ফুটবলের মধ্যে ফাঁপা অর্থাৎ হালকা বাতাস পুরা।

আবার সেই ভারী আর হালকা কথাই এসে গেল।

কোনও কিছুর মধ্যে যে জড় পদার্থ আছে তাকে বলা হয় ভর (mass), এই ভর থেকে হয়ত ভার হয়েছে। যেমন, ভার-বোঝা। আবার এই ভার থেকে যদি আমরা ভারী বলি, তা হলে কিন্তু মস্ত বড় ভুল হবে। কারণ, আগেই বলেছি, 'ভর' হচ্ছে কোন কিছুর মধ্যে যে জড় পদার্থ সেটাই। কিন্তু 'ভারী' বলতে ওজনের কথা আসে। জিনিষের ওজন যদিও তার ভরের উপরেই নির্ভর করে—অর্থাৎ যার ভর যত বেশি তার ওজনও তত বেশি; কিন্তু ওজনের মধ্যে আর একটা ব্যাপার থাকে। সেটা হচ্ছে, বস্তুর উপর পৃথিবী মোট যে অভিকর্ষ বল প্রয়োগ করে সেইটা। সেটাই ঐ বস্তুর ওজন।

আবার একটা নতুন কথা এসে উপস্থিত হল অভিকর্ষ।

গোড়ায় আমরা নিউটনের কথায় বলেছি, তিনি একটা ফলকে মাটির উপর পড়তে দেখে আবিষ্কার করলেন পৃথিবীর অভিকর্ষ শক্তি। তাতে তিনি বললেন, পৃথিবী সব বস্তুকেই নিজের দিকে টানছে। এই টানটা হচ্ছে একটা শক্তি। অবশ্য এই টান বা অভিকর্ষ শক্তির স্থান বিশেষে

তারতম্য হয়। পৃথিবীর প্রান্ত দেশে এই টান হয় বেশি, মাঝখানে হয় কম। এইজন্য কোনও পদার্থ, যেমন ধরো দশ কিলো ওজনের একখানা থান ইট। ইটখানাকে পৃথিবীর উত্তর বা দক্ষিণ মেরুতে নিয়ে গিয়ে ওজন করলে দেখবে, ওর ওজন দশ কিলোর বেশি হয়ে গিয়েছে! আবার বিষুব রেখার কাছে বা খুব উঁচু পাহাড়ের উপর ইটখানা নিয়ে গেলে দেখবে তার ওজন দশ কিলোর কম! আসলে কিন্তু ইটখানার ভর অর্থাৎ ওটার পোড়া মাটির পরিমাণ সর্বত্র একই থাকবে।

ফুটবলটা কেমন জোরে ছুটে যায়, আর বাতাবি লেবুটা কিছুতেই যেন নড়তেই চায় না!

না, কোন জড়বস্তুই নিজের থেকে ছোটে না। তাকে ছুটাতে হয়। কেবল বাতাবি লেবু কেন, সব বস্তুই চুপচাপ পড়ে থাকতে চায়। এটা হচ্ছে জড় পদার্থের স্বভাবধর্ম। ওদের ঘা মেরে বা প্রয়োজন ক্ষেত্রে লাথি মেরে চালাতে হয়। নিউটন তাঁর প্রথম গতিসূত্রে বলেছেন, বাইরের থেকে প্রযুক্ত বল দিয়ে অবস্থার পরিবর্তন না করলে স্থির বস্তু চিরদিন স্থির অবস্থাতেই থাকবে এবং সচল বস্তু সমগতিতে সরলরেখা ধরে চিরকাল চলবে।

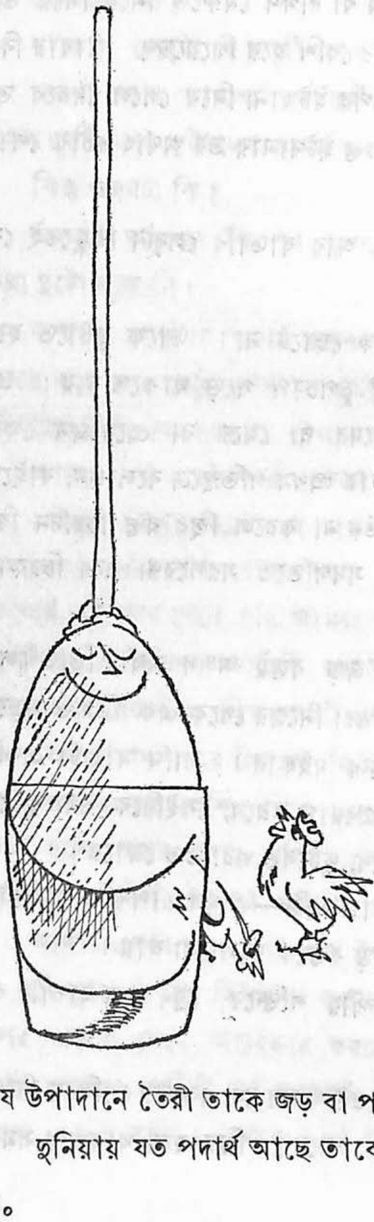
সহজ কথায়, জগতের প্রত্যেক জড় বস্তুই অলস অর্থাৎ স্থিতিশীল। ফুটবল বা লেবুটাকে মাঠে রেখে দাও, ওরা নিজের থেকে এক তিলও নড়বে না। সেইজন্য ওদের চালাতে শক্তির দরকার। লাথি মারাটা একটা শক্তির প্রয়োগ। যে দিকে ঐ শক্তি প্রয়োগ করবে, সেইদিকে ওরা ছুটবে আর যত জোরে ঐ শক্তি প্রয়োগ করবে, ছুটবেও ওরা তত জোরে।

ঘা-গুঁতো, লাথি মারা ছাড়াও অন্যান্য শক্তি—যেমন তাপশক্তি, বাষ্পীয় শক্তি, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি প্রয়োগেও জড় বস্তুকে চালানো যায়।

যেমন স্টীমার চলে স্টীম বা বাষ্পীয় শক্তিতে, ট্রেন চলে বাষ্পীয় বা বিদ্যুৎ শক্তিতে।

নিউটন বলেছেন, জড় বস্তুগুলি এতই অলস যে একবার চালিয়ে দিলে সমগতিতে সরল রেখা ধরে চিরকাল চলবে! স্থির হয়ে থাকবার সময়

যেমন কে আর কষ্ট করে চলে ওদের এইভাব, আবার চলবার সময়ও ভাবটা—কে আর থামে!



নিউটন যা বলেছেন, তাতে মাঠের ভিতর ঐ বাতাবি লেবুটাকে একবার লাথি মেরে চালিয়ে দিলে ওটা একটা সরল রেখায় খেলার মাঠ পেরিয়েও চিরকাল ধরে চলবে!

কিন্তু তা কি চলে? না, চলে না। তবে? নিউটন তো গোড়াতেই বলে দিয়েছেন,—আর কোন বাইরের শক্তি ঐ সচল বস্তুকে বাধা না দিলে অর্থাৎ ওর চলার অবস্থার পরিবর্তন না ঘটালে তবেই সে নিরন্তর চলবে।

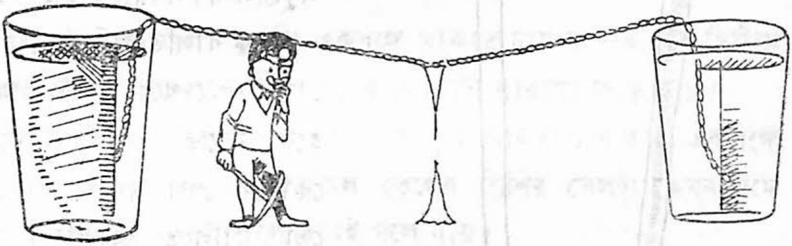
কে লেবুটার গতিপথে বাধা দিল? অনেক কিছুতেই বাধা দিতে পারে। তার মধ্যে একটা—যেমন ধরো ঘর্ষণ। ঘাসের উপর ঘষা খেতে খেতে বাধা পেয়ে বলটির গতি যায় কমে। অবশেষে ওটা থেমে যায়।

যা আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝতে পারি, যার ওজন ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে তা-ই বস্তু। বস্তু যে উপাদানে তৈরী তাকে জড় বা পদার্থ বলা হয়।

দুনিয়ায় যত পদার্থ আছে তাকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি।

এই তিন ভাগ হল কঠিন (solid), তরল (liquid) ও বায়বীয় বা গ্যাসীয় (gaseous)। ইট-কাঠ-লোহা-পাথর এগুলি হচ্ছে কঠিন পদার্থ। জল-দুধ-তেল এসবকে বলা হয় তরল আর বাতাস বা অক্সিজেন প্রভৃতি গ্যাসকে বলা হয় বায়বীয় বা গ্যাসীয়।

কঠিন পদার্থের আছে নিজস্ব আকৃতি এবং আয়তন। বল প্রয়োগ না করলে তার সে আকৃতি ও আয়তনকে বদলানো যায় না। যেমন একখানা ইট। তার একটা আকৃতি আছে, একটা আয়তনও আছে। হাতুড়ি দিয়ে



ঘা মেরে গুড়ো গুড়ো করে তার আকৃতি ও আয়তনের পরিবর্তন করা যায়।

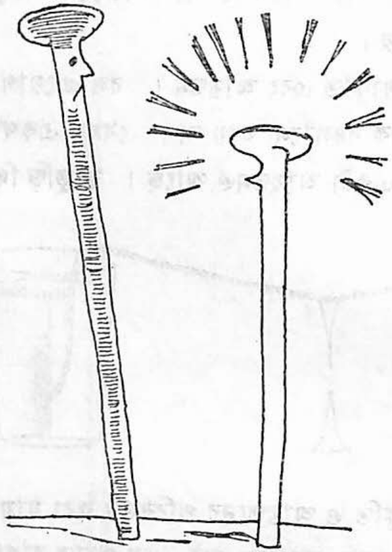
তরল পদার্থের কিন্তু নিজের কোন আকৃতি নেই ; যে পাত্রে রাখবে তরল পদার্থ সেই পাত্রের আকৃতি নেবে। জলকে থালায় রাখলে থালার মতো, গেলাসে রাখলে গেলাসের মতো থাকবে। তার একটা আয়তন অবশ্য থাকবে। যে যায়গা সে জুড়ে থাকবে সেইটাই তার আয়তন।

বায়বীয় পদার্থের কিন্তু না আছে নিজস্ব আকৃতি না আছে নির্দিষ্ট কোন আয়তন।

বোতলে দুধ রাখো। যত পরিমাণ দুধ, বোতলের সেই পরিমাণ যায়গা নিয়ে দুধটা থাকবে। কিন্তু ফুটবলটায় বাতাস পোরো, যতটুকুই বাতাস ঢুকাও সেটা বলটার ভিতরের সবখানি যায়গা জুড়ে থাকবে। রান্নাঘরে যখন উনুনের কয়লার ধোঁয়া ওঠে তখন সেটা ঘরের এককোণে জমা হয় না, সারা ঘরটা জুড়ে থাকে।

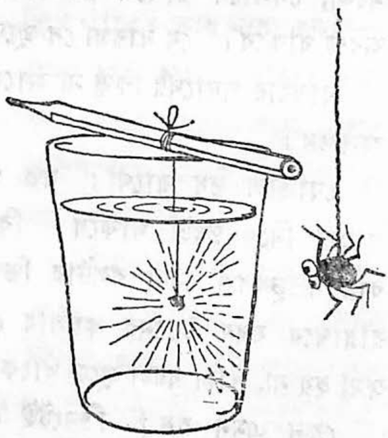
কেন এমন হয়? তিনটেই তো পদার্থ। তাহলে এদের আকৃতি-প্রকৃতি এমন আলাদা কেন?

তার কারণ, পদার্থ মাত্রই অসংখ্য অণু দিয়ে তৈরী। প্রত্যেক রকম পদার্থের অণুর স্বভাবও আলাদা। ঘন পদার্থের অণুগুলি খুব গায়ে গায়ে এঁটে থাকে। ছাড়াছাড়ি হতে চায় না তারা। তরল পদার্থের অণুগুলি থাকে আলগা ভাবে। সুযোগ পেলেই এরা ছাড়াছাড়ি হয়। আর বায়বীয় পদার্থের অণুগুলি সব সময় ছুটাছুটি করে।



এক বালতি বালির মধ্যে জল ঢালো। দেখবে জলটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বালির মধ্যে। কোথায় গেল জল? বালতিটা তো বালিতে বোঝাই। জল উপচে পড়ছে না কেন? তার কারণ, বালির কণাগুলির মধ্যে আছে যথেষ্ট ফাঁক। সেই ফাঁকের মধ্যে মধ্যে জলটা ঢুকে গেল।

এক গেলাস জলের মধ্যে এক খণ্ড মিছরি ছেড়ে দাও। কিছুক্ষণ পরে দেখবে, মিছরিটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে! কোথায় গেল মিছরিটা? গেলাসের ঐ জলটার আস্বাদ নাও। দেখবে, ওটা মিষ্টি। গেলাসের ঐ জলটার আস্বাদ নাও। দেখবে, ওটা মিষ্টি। মিছরির কণাগুলি জলের কণার ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে গিয়ে অদৃশ্য হয়েছে।



একটা পাথরের চাংড়া জলের মধ্যে ছেড়ে দিলে তা কিন্তু গলবে না। তার কারণ পাথরের চাংড়ার কণাগুলি পরস্পর খুব এঁটে থাকে, খুব জোরে ঘা বা গুঁতো না মারলে কিছুতেই তারা ছাড়াছাড়ি হতে চায় না। কিন্তু মিছরির কণাগুলি আলগাভাবে থাকে। কর্পূরের বেলাতেও তাই।

তরল পদার্থের কণাগুলি সুযোগ পেলেই বেরিয়ে যেতে চায়। একটা আলগা পাত্রে কেরোসিন তেল রেখে দাও। দু-একদিন পরেই দেখবে, পাত্রে এক ফোঁটাও তেল নেই। পাত্রটার মুখ ঢাকা থাকলে কিন্তু তেলের কণাগুলি উবে যেতে পারত না।

বায়বীয় পদার্থের অণুগুলি একসঙ্গে থাকতে চায় না—ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে চায়। ঘরে ধূনো দিলে ধূপের ধোঁয়াটা সারাঘর জুড়ে যায়।

উত্তাপ দিলে কিন্তু সব অণুই ছড়িয়ে পড়ে। আর ঠাণ্ডায় তারা একসঙ্গে গুটিয়ে যায়। শীতকালে নারকেল তেলের শিশির তেলটা কেমন জমে থাকে। ওটাকে রৌদ্রে দিলে তবেই গলে যায়।

উত্তাপ দিলে সব পদার্থই যে তাড়াতাড়ি গরম হয় এমন নয়। প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে একখানা কুড়ুল ফেলে রাখলে দেখবে, ওর কাঠের হাতলটা তেমন গরম হয়নি; কিন্তু লোহার কুড়ুলটায় হাত দেওয়া যাচ্ছে না এমন গরম। কাঠের চেয়ে লোহা উত্তাপটাকে টানতে পারে খুব তাড়াতাড়ি। তাপ পরিবহণের ক্ষমতা কাঠের চেয়ে লোহার বেশি।

অণুর কথা বলা হল; কিন্তু অণুই পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ নয়। অণুকেও খণ্ড খণ্ড করা যায়, তার থেকে পাওয়া যায় পরমাণু। অনেকদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা পরমাণুকেই পদার্থের শেষ অবস্থা বলে মনে করেছেন। কিন্তু তারপর দেখা গেল, পরমাণুকেও ভেঙ্গে টুকরো করা যায়। পরমাণুর একটি কেন্দ্রীয় অংশ—যার নাম নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের চারধারে পরিভ্রমণ করে এক রকমের কণা—তাকে বলা হয় ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে প্রোটন। ইলেকট্রনের থাকে নেগেটিভ চার্জ আর প্রোটনের চার্জ পজিটিভ।

ভরের কথা বলা হয়েছে আগে। দুনিয়ার সব কিছু বস্তুর যে মোট

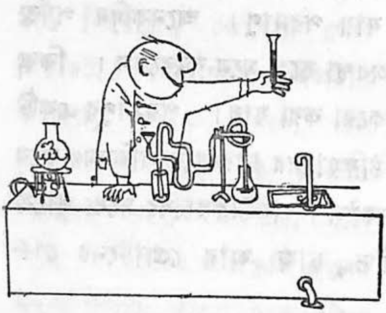
ভর, তা কিন্তু বাড়েও না কমেও না। পদার্থের পরিবর্তন হতে পারে। ঘনকে তরল করা যায়, তরলকে বায়বীয় করা যায় কিন্তু ওদের 'ভর' একই থাকে।

কথাটা শুনে অবাক লাগবে হয়ত। আগেই বলা হয়েছে, পদার্থের ওজন তার ভরের উপর নির্ভর করে। একখানা মোটা পাঁচ কেজি ওজনের বই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মনে হতে পারে বইখানার পাঁচ কেজি ওজন আর রইল না। ছাইয়ের আর কতটুকুই বা ওজন! আসলে কিন্তু তা নয়! বইখানা পুড়বার সময় যে ধোঁয়া বেরিয়ে গেল, তার ওজন ধরছে কে? কৌশল করে ধরতে পারলে দেখা যেত, সেই ধোঁয়া এবং ছাইয়ের যে ওজন তা ঐ বইয়ের পাঁচ কেজি ওজনেরই সমান। পরীক্ষা করে এ সত্যটা জানা গিয়েছে।

পদার্থের কাজ করবার সামর্থ্যকে শক্তি বলা হয়। শক্তি না থাকলে জগৎ অচল হয়ে যেত। উত্তাপ, আলো, তড়িৎ এগুলি শক্তি। শক্তির রূপান্তর হতে পারে কিন্তু তার ক্ষয় হয় না। বিজ্ঞানীরা বলেন, আমরা নতুন করে কোন শক্তি (energy) সৃষ্টি করতে পারি না, ধ্বংস করতেও পারি না। বিশ্বসৃষ্টির প্রথমে যে শক্তি ছিল, এখনও তাই-ই রয়ে গিয়েছে। তার ক্ষয়ও নেই বৃদ্ধিও নেই।

পদার্থ আর শক্তি এই নিয়ে পদার্থ বিজ্ঞান।

কেউ কেউ মনে করেন, পদার্থ বিদ্যা (Physics) আর রসায়ন বিদ্যা (Chemistry) বুঝি সম্পূর্ণ আলাদা। তা কিন্তু নয়। গোড়াতেই বলা হয়েছে, সুবিধার জন্য বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে বিভিন্ন শাখায় ভাগ করে নেওয়া হয়েছে, তাই বলে এরা পরস্পর আলাদা নয়। 'ভূ-বিজ্ঞানে'র সঙ্গে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গেও রসায়ন বিজ্ঞানের



তেমনি ঘনিষ্ঠতা আছে। একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

পদার্থ বিজ্ঞানের বিষয় হচ্ছে, পদার্থ এবং পদার্থ থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এবং এবং সেই শক্তিকে কাজে লাগানো। রসায়নের ব্যাপারটা হল পদার্থের ধর্ম ও গঠন নিয়ে আলোচনা। পরমাণু গঠন এবং শক্তি ক্ষরণের ব্যাপারে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞান এক হয়ে কাজ করে।

আগুন নিয়ে খেলা

আগুন! আগুন!! আগুনের কথা শুনলে আমরা ভয়ে চম্‌কে উঠি। ভাবি, এক্ষুনি বুঝি সব পুড়েটুরে ছাই হয়ে গেল। আগুনের কথায় কখনও কখনও আবার কামান-বন্দুকের চিন্তাও আমাদের মনে আসে।

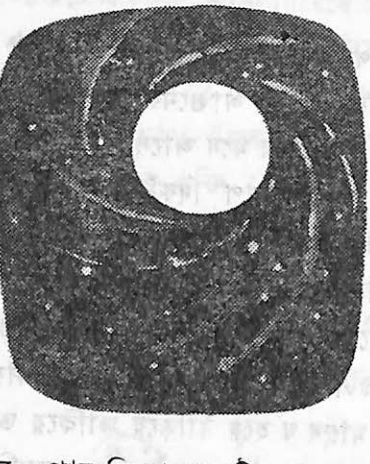
কিন্তু কেন আগুনের কথা উঠলে তার খারাপ দিকটাই আমাদের বিচলিত করে? আগুনের হাজারো ভালো দিকও যে রয়েছে—কই, তার কথা তো আমাদের চট্ করে মনে পড়ে না। মানুষ আগুন জ্বালাতে পেরেছিল বলেই আজ এত উন্নতি করতে পেরেছে। মনে করে দেখ তো সেই দিনটির কথা যেদিন কি ভাবে একটা পাথরের সাথে আর একখানায় ঘষা লেগে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল। মানুষ থ হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে তা দেখল। সে ঐ পাথর নিয়ে আবার ঘষল। ঐ পাথরটা ছিল চক্‌মকি পাথর। তারপর কত দিন কেটে গেছে। এখন মানুষ মাথা খাটিয়ে সহজেই যে কোন জায়গায় আগুন জ্বালাতে পারে।

আগুন আছে বলেই আমরা রান্না করতে পারি, জল গরম করতে পারি, শীতের দিনে আগুন জ্বালিয়ে আরামে তার পাশে বসে থাকি। এ ছাড়া তোমার ঘরের চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখ। মাটির হাঁড়ি, মাটির পুতুল, জানালার কাচ, ক্যালেণ্ডার, দেওয়ালের তৈলচিত্র, আসবাবপত্র,

ঘড়ি, প্লাস্টিক, এমন কি কলম বই খাতা—যা তোমার চোখে পড়ছে এসব তৈরী করতে কোন না কোন ভাবে আগুনকে কাজে লাগানো হয়েছে। আগুন যেমন সর্বনাশা ধ্বংসের কারণ তেমনি সৃষ্টির কারণও এই আগুন।

তোমার পড়ার টেবিলের ঘড়িটা নিশ্চয়ই স্টীলের তৈরী। স্টীল, লোহা এবং অন্যান্য সব ধাতুই এদের ধাতব পদার্থকে উঁচু তাপমাত্রায় গলিয়ে পাওয়া যায়। লেখার কালিও তৈরী হয় আংশিক ভাবে পেট্রোলিয়ামকে জ্বালিয়ে।

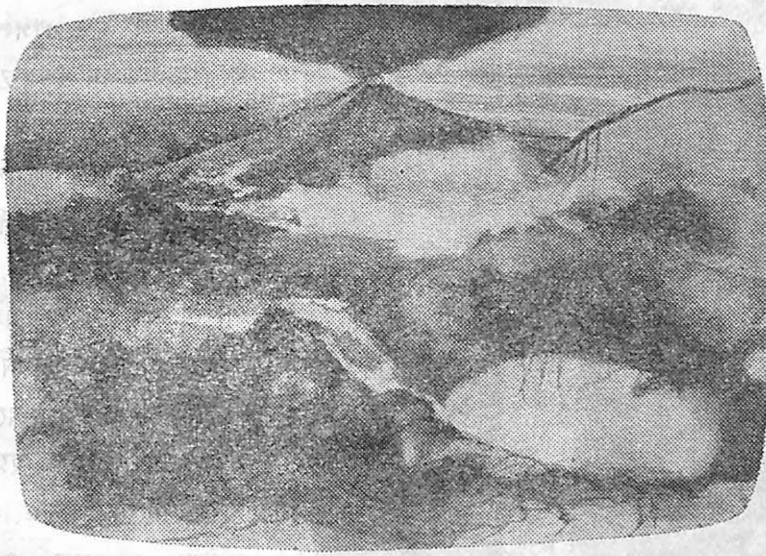
মাটির হাঁড়ি, গেলাস, কড়াই, পুতুল ইত্যাদিও তৈরী হয় ওদের কাঁচা মাটির ছাঁচ থেকে। পরে ওটা আগুনে পুড়িয়ে নেওয়ার দরকার হয়। এ ছাড়া রবার, নাইলন, রং বার্নিশ, চামড়া ট্যানিং—সব কিছু তৈরী করতেই আগুন চাই। রাস্তা দিয়ে যে মোটর গাড়ীটা এক্ষুনি ছুটে বেড়িয়ে গেল সেটাও আগুন জ্বলে বলেই এগিয়ে যেতে পারে। এঞ্জিনের পেট্রোলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় তার ফলেই ওটা ছুটে চলে জোরে। পৃথিবীর কেন্দ্রের সব বস্তুও আগুনের মতো গরমে ফুটছে টগ্‌বগ্‌ করে। অনেক অনেক



দিন—প্রায় তিনশ কোটি বছর আগেকার কথা মনে কর। সেই যখন সূর্য থেকে বিরাট গোলাকার জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড ছিটকে বেরিয়ে তার চার-দিকেই আবার ঘুরতে শুরু করেছিল! সেই জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডই ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে আজকের পৃথিবী তৈরী হয়েছে। পৃথিবীর বুকের উপর যে পাথর শিলা ইত্যাদি আমরা দেখতে পাই সেটা একসময় গলিত লাভা জমে ঠাণ্ডা হয়েছিল বলেই তো! তাছাড়া এখনও পৃথিবীর কেন্দ্রে তরল পাথর (ম্যাগমা) টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। এই ম্যাগমার চাপ এত বেশী যে মাঝে

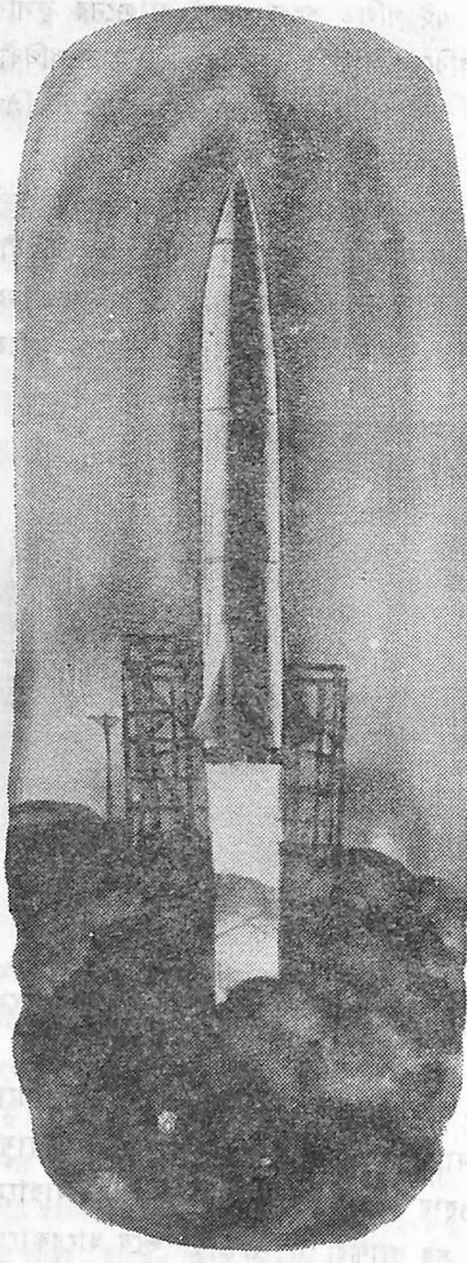
মাঝে আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে এই গলিত তরল পদার্থ আগুনের ফুলকি আর ধোঁয়ার সাথে বাইরে বেরিয়ে আসে। আমরা নিশ্চিন্তে পৃথিবীর উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তাই পৃথিবীর কেন্দ্রের ওই সব ফুটন্ত গলিত ধাতুদ্রব্যের অবস্থার কথা চিন্তাও করতে পারি না।

পৃথিবীর সৃষ্টির সময় কোনও গাছপালা, প্রাণী, মানুষ—এসব কিছুই ছিল না। তারপর আস্তে আস্তে পৃথিবী ঠাণ্ডা হল। নেমে এল পৃথিবীর বুকে বৃষ্টির ধারা, এল প্রচণ্ড তুষার যুগ। ক্রমে সাগরের বুকে জন্ম নিল ছোট ছোট উদ্ভিদ, জন্ম হল অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর। তারপর আস্তে আস্তে



বিভিন্ন ধরনের গাছপালা ও প্রাণীর জন্ম হল। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের হল আবির্ভাব।

সৃষ্টির প্রথম যুগে মানুষকে অন্যান্য ভয়ঙ্কর প্রাণীর হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছে বুদ্ধি খাটিয়ে। এজন্য আগুনই মানুষকে সাহায্য করেছে সব চাইতে বেশি। গুহার মানুষ আগুন জ্বালিয়ে যখন আরামে শীত পোহাত—তখন ভয়ঙ্কর সব প্রাণীরা ঐ আগুনের ভয়ে ধারেকাছে



ঘেঁষত না। মানুষ আরও সভ্য হল। আগুন দিয়ে সে অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করতে শিখল। রান্না করতে শিখল আগুন দিয়ে। জলে নানা রংয়ের মাটি গুলে আগুনে ফুটিয়ে নিয়ে সে রং তৈরী করল। মানুষ গুহায় চমৎকার সব ছবি আঁকতে লাগল। রান্নার আগুন শিল্পসৃষ্টি করতেও এল এগিয়ে।

সেই সৃষ্টির আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ আগুনকে অত্যন্ত পবিত্র বস্তু বলে মনে করেছে। আবার বহু ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপও আগুনকে সাক্ষী রেখে করা হয়। আগুনের পরশমণি প্রাণে ছুঁইয়ে জীবনকে পুণ্য করবার সাধ জাগে কবির মনে। "হেথা নয়, হেথা নয়—অন্য কোথা, অন্য কোনখানে" ছুটে যাবার স্বপ্ন সত্যি হল মানুষের মহাকাশে

রকেটে করে পাড়ি জমিয়ে। রকেটের জ্বালানীতে আগুন চাই। মানুষের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নিত্যসঙ্গী আগুনকে তাই জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

মোমবাতির ল্যাবরেটরী

ডিংকু এসে হাসুবানু, চন্দ্রভানু, অতুল, তুলু, বাবুন-মিঠুনের সামনে সগর্বে ঘোষণা করল—'এক্ষুনি আমি সকলের সামনে বিরাট একটা ল্যাবরেটরীকে দেখাবো।'

সকলে তো অবাক। এ ওর মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে —কারণ বিরাট একটা ল্যাবরেটরী তো আর সরষের দানার মতো ছোট্ট জিনিষ নয় যে হাতের মুঠোয় লুকিয়ে রাখবে ডিংকু! সবাই যখন একবাক্যে চেঁচিয়ে বলে উঠল—অসম্ভব, এ হতেই পারে না, ডিংকু তখন প্যান্টের পকেট থেকে ছোট্ট একটা জিনিষ বার করে টেবিলের উপর রাখল।

ছোটর দল সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল জিনিষটা কি তা দেখবার জন্য।

যখন সবাই বুঝল জিনিষটা সামান্য একটা মোমবাতি ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন ওদের কেউ মুখ টিপে হাসল, কেউ বা আবার মোমবাতিটা নিয়ে অবাক হবার ভান করে নেড়েচেড়ে ওটা রেখে দিল।

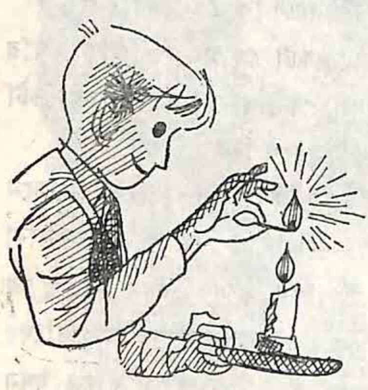
ডিংকু কিন্তু পিছু হঠবার ছেলে নয় মোটেই! সে সকলের সামনে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করল—'আমার কথা শুনে আপনারা বোধ হয় ভাবছেন—সামান্য একটা মোমবাতির মধ্যে কেমন করে খুঁজে পাওয়া যাবে একটা প্রকাণ্ড ল্যাবরেটরীকে। এ সন্দেহ শুধু আপনাদের কেন, একশো বছর আগে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডে যখন 'মোমবাতির রাসায়নিক ইতিহাস' (The chemical History of a

Candle) এই নামে বেশ কয়েকটি সিরিজে বক্তৃতা দেন—তখনও কিন্তু কিছু লোকের মনে জেগেছিল।

কিন্তু মাইকেল ফ্যারাডে সকলের সামনে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেন—সামান্য একটা জলন্ত মোমবাতির শিখায় পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্র যুগল বন্দী হয়ে আছে। এটা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে—কিন্তু একটু পরেই আপনারা টের পাবেন আমি যা বললাম তা সম্পূর্ণ সত্যি।'

ডিংকু এইবার বক্তৃতা থামিয়ে মিঠুনকে ডেকে মোমবাতিটা জ্বালাতে বলল। তারপর জ্বলন্ত মোমবাতিটাকে সামনে রেখে আবার বলতে শুরু করল—'মোমবাতিটা জ্বালানোর সাথে সাথে কি কি ঘটনা ঘটছে তা আপনারা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখুন। সাধারণ ভাবে দেখা আর পর্যবেক্ষণের মধ্যে তফাত রয়েছে। পর্যবেক্ষণ হচ্ছে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখার মতো করে দেখা। আমাদের বিজ্ঞানে একটুখানি দেখা বা কোন-রকমে দেখার কোন দাম নেই। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাই এই পর্যবেক্ষণ কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মোমবাতি জ্বালালে কি হয়? প্রথমে কঠিন মোম গলে তরল হবে। তারপর ঐ তরল মোম বাষ্পে রূপান্তরিত হবে—যে বাষ্প জ্বলতে পারে।

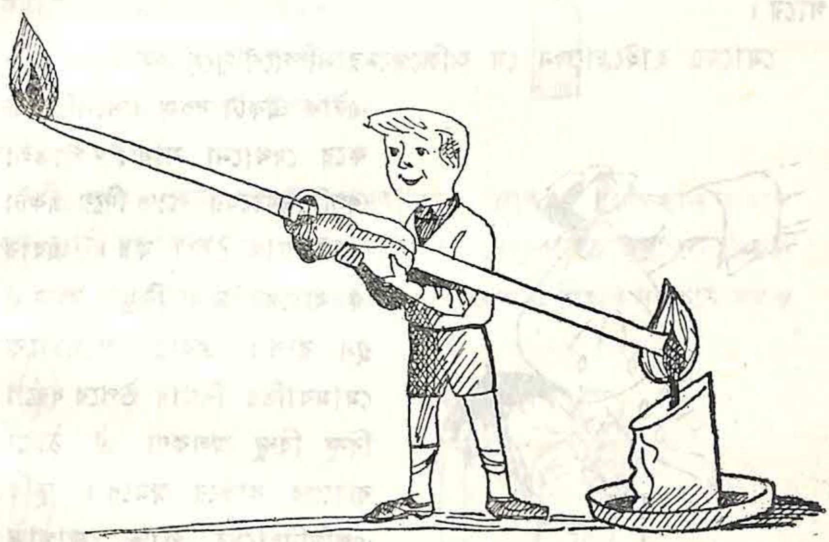


মোমবাতির পলতের মাথায় ঐ তরল মোম ম্যাজিকের মতো উঠে আসে। কেমন করে আসে তা এখন বলছি না—তবে যে নিয়মে ওটা পলতের মাথায় আসে তাকে ইংরাজীতে বলে 'ক্যাপিলারি এ্যাকসন'। আপাততঃ এই এ্যাকসন নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই।

প্রজ্জ্বলনের সময় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আগুন জ্বলে। আগুন কি তা বলা শক্ত। যেমন বলা শক্ত

বিদ্যুত কি। তবে বলা যায় আগুন হচ্ছে এক ধরনের শক্তি। আগুন জ্বলবার সময় আবার এই শক্তি নির্গত হয় তাপ ও আলো হিসাবে।

মোমবাতির আগুন যে দাহ্য বাষ্প পোড়ার ফলেই পাওয়া যাচ্ছে তা সহজেই প্রমাণ করা যায়। মোমবাতিটাকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে তক্ষুনি একটা জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি পলতের প্রায় এক ইঞ্চি উপরে ধরলে সেটা আবার দপ্ করে জ্বলে উঠবে। মোমবাতির পলতের উপরের অংশের দাহ্য বাষ্পে আগুন ধরে যায়। সেই সঙ্গে পলতেটাতেও আগুন জ্বলে ওঠে। অন্য উপায়ের সাহায্যেও এটা দেখানো চলে।



মোমবাতির শিখার ভিতরে একটা গ্লাস টিউব (প্রায় একফুট লম্বা) রাখতে হবে যার মাথাটা আগে থেকে আগুনে পুড়িয়ে কায়দা করে ছুঁচলো করা হয়েছে। এইবার ওই গ্লাস টিউবের ছুঁচলো মুখে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ধরলে দাহ্য বাষ্প, যেটা মোমবাতির শিখা থেকে বেরিয়ে আসছে তাতে আগুন ধরে যাবে। গ্লাস টিউবের মাঝখানটা একটা রুমাল

দিয়ে ধরতে হবে—যেন হাতে গরম না লাগে। দহন অথবা প্রজ্বলন হচ্ছে কোনও বস্তুর সাথে অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল। মোম হচ্ছে একটি জটিল রাসায়নিক যৌগ—কারবন এবং হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরী। প্রজ্বলনের সময় মোমের কার্বন বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বন-মনো-অক্সাইড ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরী করে। মোমের হাইড্রোজেন সেইরকম বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল তৈরী করে। খুব সহজেই এ জিনিষটা বোঝান যায়।

মোমের মধ্যে যে কার্বন রয়েছে তা প্রমাণ করতে হলে একটা কাচের প্লেট মোমবাতির আগুনের শিখায় ধরতে হবে। কালো ভুসো পড়বে প্লেটের গায়ে।

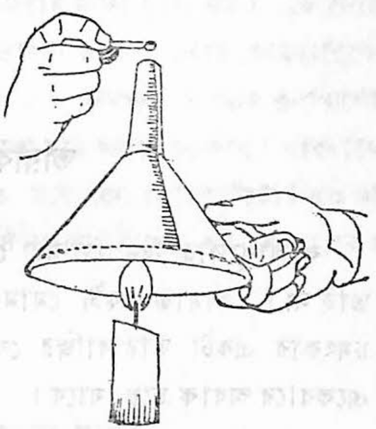
মোমের হাইড্রোজেন যে অক্সিজেনের সংস্পর্শে পুড়ে জল উৎপন্ন করে



এটাও একটা সহজ এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখানো যায়। পাতলা এলুমিনিয়ামের পাত দিয়ে একটা ছোট্ট ব্যাগ তৈরী কর। এবার ঐ ব্যাগের মধ্যে কিছুটা বরফ ও নুন রাখ। এবার ব্যাগটাকে মোমবাতির শিখার উপরে ধরলে বিন্দু বিন্দু জলকণা ঐ ঠাণ্ডা ব্যাগের বাইরে জমবে। তুমি এলুমিনিয়ামের পাত জোগাড় করতে না পারলে আর একটা কাজ করে দেখতে পার। যদিও তাতে আশানুরূপ ফল নাও হতে পারে। একটা ছোট্ট গেলাসকে মুখ উল্টিয়ে ঐ শিখার বেশ কিছুটা উপরে ধর। দেখবে গেলাসের ভিতর বিন্দু বিন্দু জল জমেছে।

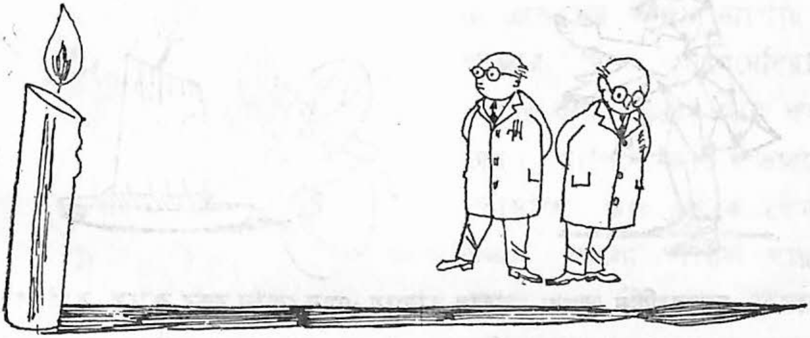
আগেই বলেছি দহনের সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।

এটা বুঝতে হলে মোমবাতির উপর একটা ফানেল উল্টো করে ধর। এবার একটা জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ফানেলের নলের মুখে আনলেই দেখবে ওটা নিভে যাচ্ছে।



মোমবাতির শিখাকে খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ কর। কি দেখছো! দেখবে শিখার মাঝখানটা অন্ধকার। তার চারপাশের জ্বলন্ত কারবন কণাগুলোর জন্যই আলো ঠিকরাচ্ছে। মোমবাতির পলতের ঠিক নীচের অংশটা সুন্দর নীল হয়ে জ্বলছে। তার উপরের শিখার রং হলুদ।

যদি তুমি একটা জ্বলন্ত মোমবাতিকে রোদ্দুরে রেখে দাও তাহলে একটা ভারি মজার ব্যাপার দেখতে পাবে। মোমবাতির ছায়াকে একটা বড় সাদা কাগজের উপর পড়তে দাও। দেখবে, শিখার সবচেয়ে জ্বলন্ত



অংশের কালো ছায়া পড়েছে। কিন্তু শিখার মাঝখানের অংশে কোন ছায়া দেখতে পাবে না। ওই জায়গায় গ্যাসীয় অংশের ভিতর দিয়ে আলো সহজে বেরিয়ে যেতে পারেনি, তাই ছায়াও হয়নি তার। সেদিন

ডিংকুর মোমবাতির ল্যাবরেটরী দেখে ছোটর দল একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল, সন্দেহ নেই।

তারাবাজির খেলা

কালীপূজোর দিন তোমরা কেমন সুন্দর তারাকাঠির বাজি পোড়াও, তাই না? সামান্য একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে তোমরা ঐ ধরনের এমন চমৎকার একটা তারাবাজির খেলা দেখাতে পার যে সবাই তা দেখে একেবারে অবাক হয়ে যাবে। একটুকরো রজন যোগাড় করার চেষ্টা



কর; ভায়োলিন অথবা সেতার বাজায় এমন কোন বন্ধুর কাছে চাইলেই পাবে। রজন না পেলে জিওল গাছের গায়ে শক্ত আঠার মতো লাল জিনিষটা পেলেও চলবে। রজন অথবা জিওলের শক্ত আঠাকে একটা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে হাতুড়ি দিয়ে গুঁড়ো কর। একেবারে গুঁড়িয়ে পাউডারের মতন করলেই সব চাইতে ভাল হবে।

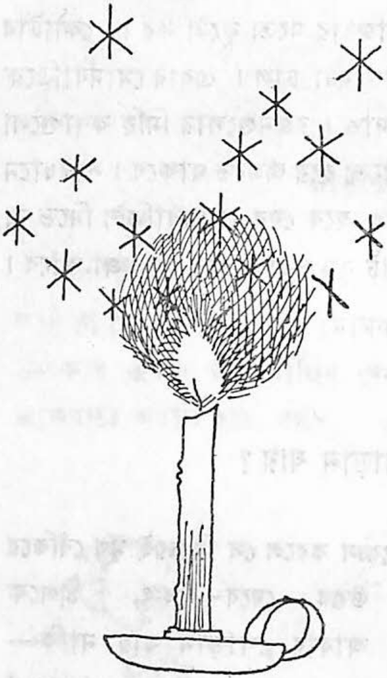
এবার একটা প্লাস্টিকের তৈরী নুনের ডিবে—যার মাথায় ছোট-ছোট ফুটো আছে তা যোগাড় কর। ওটা পাওয়া না গেলে একটা ছোট্ট টিনের কৌটোর ঢাকনা সরু পেরেক দিয়ে ঝাঁজরার মতো ফুটো কর। কৌটোর মধ্যে রজন অথবা জিওলের আঠার পাউডারটা ঢাল। এবার মোমবাতিকে জ্বালিয়ে তার শিখায় অল্প রজন ছড়িয়ে দাও। রজনগুলোর মিহি কণাগুলো অক্সিজেনের সংস্পর্শে চমৎকার তারার মতো হয়ে জ্বলতে থাকবে। সাবধানে এমনভাবে রজনগুলোকে ছিটিয়ে দিতে হবে যেন মোমবাতিটা নিভে না যায়। এটা ভারী মজার খেলা। ছোট বড় সবাই এতে খুব মজা পাবে।

ষ্টীলকে কি পোড়ান যায়?

তোমার কোনও বন্ধুকে একথা জিজ্ঞেস করলে সে নিশ্চয়ই মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দেবে—'ধ্যেৎ, ষ্টীলকে আবার পোড়ান যায় নাকি—এ একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।' পূজোর দিনে ম্যাগনেসিয়াম তারের কথা একবার মনে করে দেখ। ম্যাগনেসিয়ামের তারকে পোড়ালে তার থেকে কেমন উজ্জ্বল আলো পাওয়া যায়। লোহা এবং ষ্টীলকেও সেইরকম কায়দা করে পোড়ান যায়। এখানে আমরা অল্প কিছু ষ্টীল উলকে পুড়িয়ে চমৎকার আলোর ফুলকি বের করব—যা দেখলে তোমার বন্ধুরা একেবারে অবাক হয়ে যাবে।



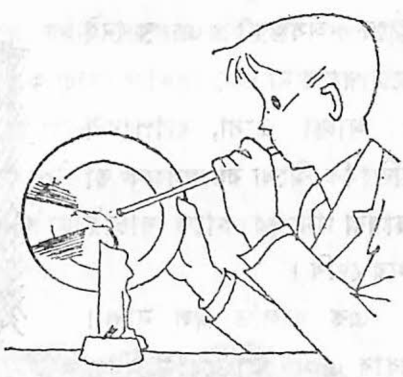
একটা তারের মাথায় সামান্য কিছু ষ্টীল উল জড়িয়ে নাও। তারের অপর দিকটা কিছু ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে নাও যেন ওটা গরম হলেও তোমার ধরতে কোনও অসুবিধা না হয়।



এইবার একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে তার শিখায় ঐ ষ্টীল উলকে ধর। দেখবে ঐ উলের ভিতর থেকে কেমন সুন্দর আলোর ফুলকি ঠিকরে বেরুচ্ছে। এই আগুনের ফুল্‌কিগুলো কিন্তু মোটেই বিপজ্জনক নয়। এই তারার মতো ফুল্‌কি আসছে কোত্থেকে বল তো? কোত্থেকে আবার! ষ্টীল পুড়ছে বলেই—আর সেই সঙ্গে আগুনের শিখায় বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে আয়রন অক্সাইডে।

কালো ভুসো এল কোথা থেকে ?

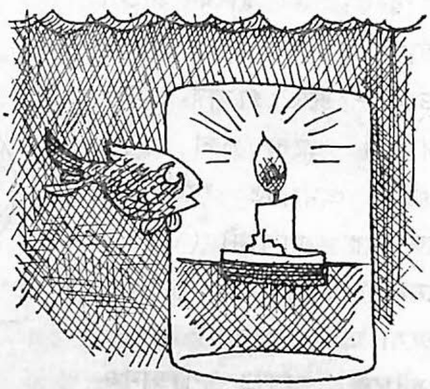
মোমবাতির শিখার উপর একটা স্টীল অথবা কাচের প্লেট ধরলে তার উপর কালো ভুসো রংয়ের একটা প্রলেপ পড়ে। এই কালো ভুসো এল কোথা থেকে ? এটা হচ্ছে কারবর। এই কারবন ভালো ভাবে জ্বলতে পারেনি বলেই ভুসো পড়েছে তোমার প্লেটের গায়ে। ভুসো পড়া থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে তোমার জ্বালানী (এখানে মোম) কিছুটা নষ্ট হয়েছে। ভুসো যদি কারবন হয় তাহলে সেটাকে আবার পোড়ানও যাবে নিশ্চয়।



একটা পলিথিনের তৈরী স্ট্র নিয়ে তার একটা মুখের সামনে কিছু কাদা-মাটি লেপে দাও। এবার ঐ বন্ধ মুখটির কাদামাটির মধ্যে দিয়ে একটা আলপিন ঢুকিয়ে ফুটো কর যেন স্ট্র-এর পিছন দিক থেকে ফুঁ দিলে বাতাস বেরুতে পারে। এবার স্ট্র-টাকে মুখে নিয়ে আর ভুসো মাখা প্লেটটা ডান হাতে নিয়ে মোমবাতির শিখায় এমনভাবে ফুঁ দাও যেন ঐ শিখা গিয়ে প্লেটের ভুসোর গায়ে পড়ে। খানিকবাদেই সবাই অবাক হয়ে দেখবে প্লেটটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং তাতে একবিন্দু ভুসোকালিও লেগে নেই। কোথায় ভুসোগুলো গেল বলতে পার ? কোথায় আবার— বাতাসের অক্সিজেন পুড়ে ঐ কারবন কারবন-ডাই-অক্সাইড হয়ে পালিয়েছে, এবার বুঝতে পেরেছ নিশ্চয় !

জলের নীচে জ্বলন্ত মোমবাতি

জলের নীচে কখনও মোমবাতি জ্বলতে পারে? তুমি নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলে উঠবে—অসম্ভব! এ কখনই হতে পারে না!



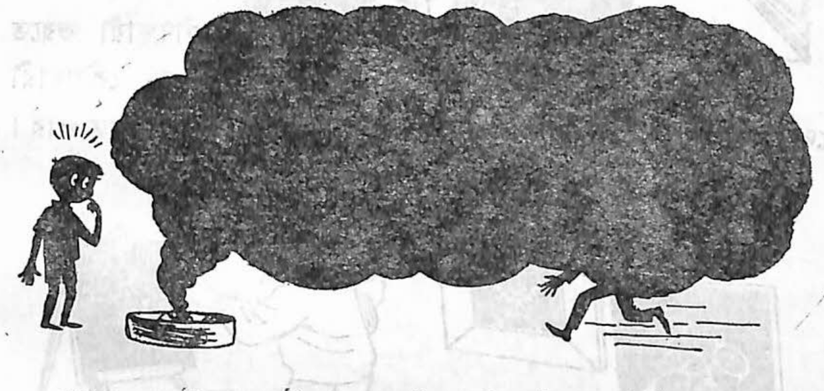
আচ্ছা এসো, ব্যাপারটা সত্যি কি মিথ্যে বা অসম্ভব তা আমরা নিজের হাতে যাচাই করে দেখি।

এক বালতি জল নাও। এবার একটা কার্ডবোর্ড অথবা বড় কর্কের উপর ছোট্ট একটা মোমবাতি বসিয়ে সেটা ঐ জলে ভাসিয়ে দাও। এবার মোমবাতিটা জ্বালিয়ে তার উপর একটা বড় মুখওয়ালা কাচের জার অথবা ঐ ধরনের কোন পাত্র বসাও। কাচের জারটাকে জলের মধ্যে জোরে ঠেলা দিয়ে নামিয়ে দাও। দেখবে, কেমন মজা—ঐ সাথে মোমবাতিটাও কেমন সুন্দর নেমে যাচ্ছে জলের নীচে। তাছাড়া তাজ্জব ব্যাপার—ঐ মোমবাতিটা জ্বলবেও বেশ কিছুক্ষণ ধরে জলের নীচে। কতক্ষণ ধরে ওটা জ্বলবে বলতে পার? কতক্ষণ আবার! যতক্ষণ ঐ কাচের জারে বাতাস থাকবে ততক্ষণই। জারের বাতাস ফুরিয়ে গেলেই মোমবাতিটা নিভে যাবে।

ভূতুড়ে ধোঁয়া

সূর্যগ্রহণ দেখবার জন্য তোমরা একখণ্ড কাচে কালো ভুসো লাগিয়ে নাও —তাই না? তখন ঐ ভুসো-মাখা কাচের মধ্যে দিয়ে সূর্যগ্রহণ দেখলে চোখের কোনও ক্ষতি হয় না। তাহলে দেখ সামান্য ভুসো আমাদের একসময় কত কাজে লাগে। আগে যখন তেলের প্রদীপের ব্যবহার প্রচলিত ছিল তখন খুব সহজেই তার থেকে ভুসো পাওয়া যেত। মোমবাতির শিখায় একটা কাচের প্লেট ধরলেও ভুসো পাওয়া যায়।

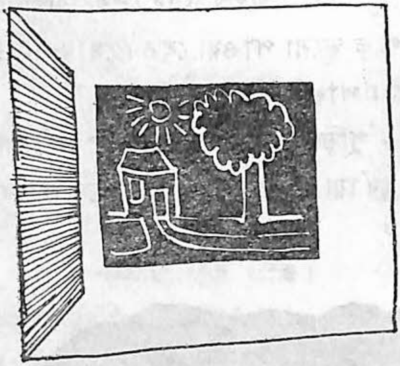
আজকাল টারপেনটাইন তেলকে পুড়িয়ে খুব সহজেই প্রচুর কালো ভুসো পাওয়া যায়। এটা পুড়িয়ে এত ধোঁয়া বেরুবে যে সবাই মনে করবে এটা একটা ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা।



প্রথমে একটা বড় টিনের ঢাকনিতে কিছু টারপেনটাইন তেল ঢাল। এবার খানিকটা তুলো ঐ ঢাকনির উপর রেখে ঐ তুলোয় আগুন ধরিয়ে দাও। টারপেনটাইন তেল পুড়ে ঘন কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি করবে। অনেক সময় তোমরা কারখানার চিমনি দিয়ে ঘন কালো রংয়ের ধোঁয়া বেরোতে

দেখ। এর অর্থ হচ্ছে কারখানায় ব্যবহৃত জ্বালানীর কিছু অংশ ভালভাবে পুড়তে পারেনি এবং বেশ কিছু জ্বালানী নষ্ট হচ্ছে।

এখানে টারপেনটাইন তেলেরও ঠিক ঐ একই অবস্থা। অর্থাৎ ভালভাবে পুড়তে পারেনি—তাই কালো ভুসোযুক্ত ধোঁয়া ছড়াতে পারছে চারদিকে। একটা বড় কাচের জার অথবা সাদা প্লেট বা একখণ্ড কাচ এনে ঐ ধোঁয়ার সামনে ধর। দেখবে কেমন পুরু পর্দার মতো কালো ভুসো তাতে লেগে রয়েছে। এই কালো ভুসোকে পাতলা ড্রইং সীট, অথবা ঐ ধরনের কিছুর ওপর বেশ ভাল করে মাখিয়ে তার উপর চমৎকার ছবি আঁকা যায়। একখণ্ড ছুঁচলো কাঠ, পেন (কালি নেই এমন), অথবা ছোট ছুরি তুমি ঐ কালি-মাখা কাগজের উপর বুলিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতে পার। যদি তুমি তোমার আঁকা এই সুন্দর ছবিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চাও তাহলে কোনও স্টেশনারী দোকান থেকে একধরনের স্প্রে কিনে এনে ঐ ছবির উপর ছিটাতে পার।





তাহলে ওটা কাগজের সাথে বেশ শক্ত ভাবে আটকে যাবে।

স্প্রে পাওয়া না গেলে তোমার কোনও আর্টিষ্ট বন্ধুর সাথেও পরামর্শ করতে পার।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। টারপেনটাইনের ভুসো সব সময় খোলা জায়গায় করবে। তা না হলে দেওয়ালে এমন বিচ্ছিরি কালো দাগ লেগে যাবে যে তা আর বলবার মতন নয়।



আলোর কথা

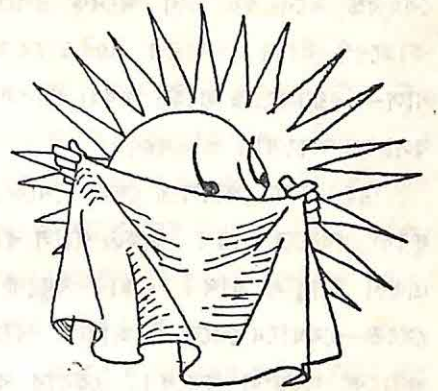
অন্ধকারে আমরা ভয় পাই, আলোয় ভয় পাই না। কারণ কেউ কেউ বলেন আমাদের আদিম পূর্বপুরুষ অন্ধকারকে ভয় করতেন —কারণ অন্ধকার এলে তারা বন্য পশুদের দেখতে পেতেন না।



এখন রকমারি আলো পেয়ে আমরা অন্ধকারকে আর পরোয়া করি না। আমরা মনে করি সমস্ত বস্তুই খুব বেশী উত্তপ্ত হলে আলো দেয়। হ্যাঁ, তা দেয় কিন্তু ঠাণ্ডা জিনিষ থেকেও আলো পাওয়া যায় না এমন নয়। অন্ধকারে ঘড়ির ডায়ালে কৃত্রিম যে বস্তুটি লাগান থাকে তা কেমন জ্বলজ্বল করে। ঘড়ির ঐ সংখ্যাগুলি এবং কাঁটা গরম জিনিষ নয় তবু রাত্রিতে তারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জোনাকি উত্তপ্ত না হয়েও আঁধারে কেমন চমৎকার মিটির মিটির আলো দেয়। সমুদ্রের খুব গভীরে কতকগুলি মাছ আছে যাদের মাথায় আলো জ্বলে। সেই আলো দেখে ছোট কোন মাছ ছুটে এলেই তারা তাকে গিলে ফেলে।

আলোর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে সূর্য। সূর্য একটি দারুণ উত্তপ্ত গোলাকার পদার্থ। এখান থেকেই যত আলো আর উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। তারই একটা সামান্য অংশ এসে পড়ে আমাদের পৃথিবীতে। আলোর গতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল এবং সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে আট মিনিট। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নয় কোটি তিরানব্বই মাইল। সূর্যদেব যদি হঠাৎ নির্বাপিত হয়ে যান তাহলে আট মিনিটের মধ্যে আমরা কিছুই টের পাবো না, কিন্তু তারপরই সব ঠাণ্ডা মেরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে।

সরল গতিতে চলাই হচ্ছে আলোর ধর্ম। অন্ধকারের মধ্যে টর্চের আলো ফেললেই তা বুঝতে পারবে। তাছাড়া ছায়ার সাহায্যেও ওটা বুঝা সহজ। ছায়া কি? আলো সরল রেখায় চলার পথে বাধা পেলে সেখানটায় কালো দেখাবে। ওটাকেই ছায়া বলা হয়। আলো যদি বেঁকে চলত তাহলে আর ছায়া পড়ত না।



তুমি যখন একটা বড় আয়নার সামনে দাঁড়াও তখন তোমার নিজের উপর যে স্বাভাবিক আলো পড়ে, সেইটাই প্রতিবিম্বিত হয় আয়নায়। তার ফলে তুমি নিজেকে এমন ভাবে দেখতে পাও যেন আয়নার পিছন থেকে তুমি এসে তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছ। তোমার ঐ প্রতিবিম্বটা অবিকল তোমার মতই দেখাবে, কেবল হাত-পা-কানগুলি উল্টোপাল্টা মনে হবে। অর্থাৎ ডান হাতকে মনে হবে বাঁ হাত এবং বাঁ হাতকে ডান হাত!



নৌকায় দাঁড় বাইবার সময় স্বচ্ছ জলের মধ্যে দাঁড়টাকে বাঁকা বলে ভুল হয়। জল থেকে দাঁড়টাকে তুললেই ভুলটা ধরা পড়বে। এক বালতি জলের মধ্যে একটা পাটকাঠি সোজা করে চুবিয়ে ধরলে কাঠিটাকে জলের মধ্যে বাঁকা মনে হয়। এই সবই চোখের ভুল, কারণ আলো সরল রেখায় চলে। যখন সেটা বাধা পায় তখনই আমাদের ধাঁধা লাগে চোখে। কাঠিটার শেষ প্রান্ত যখন জলের মধ্যে তখন এর আলোকসম্পাত জলের ভিতর থেকে বাতাসের

মধ্যে আসে এবং এইখানেই তার দিকের পরিবর্তন ঘটে। আমরা মনে করে নিই কাঠিটার শেষপ্রান্ত ঐ বাঁকানো রশ্মির রেখাতেই আছে। সেইজন্য মনে হয় ওটা অনেক উপরে—যদিও তা নয়। কাঠিটাকে এই কারণেই বাঁকা দেখায়। এইভাবে আলো যখন বেঁকে যায় তখন আমরা বলি—রিফ্রাকটেড লাইট অথবা প্রতিসরিত আলো। আর এই ঘটনাকে বলা হয় আলোর প্রতিসরণ।

এই রকম আলোর খেলা নিয়ে তোমার বন্ধুদের কাছে একটা মজার ধাঁধা দেখাতে পার। একটা খালি বালতি নিয়ে তার তলায় একপাশে একটা আধুলি রাখ। কোন বন্ধুকে বল আস্তে আস্তে পিছন হেঁটে চলে যেতে—যেখানে গেলে ঐ আধুলি আর না দেখা যায়। বালতির ধার ওটাকে আড়াল করবে। এইবার বল, আধুলিটি বা বালতিটা না সরিয়ে ঐখান থেকে কে তাকে ঐ আধুলি দেখাতে পারে। সবাই অবাক হয়ে ভাববে—তা কি করে সম্ভব?

হ্যাঁ, সম্ভব। তুমি ঐ বালতিতে জল ঢেলে দাও। এবার প্রতিসরণের জন্য ঐ আধুলিটা দেখা যাবে।

গরমকালে জ্যোৎস্নারাতে সোজা পথ বেয়ে চলবার সময় অনেকে সাদা কাপড় পরা পেত্নী দেখতে পায় সামনে। পথিক সাহসী হলে খুব জোরে জোরে পা চালিয়ে—কে যায়, তা জানবার জন্য ঔৎসুক্য নিয়ে তাকে ধরতে যাবে—কিন্তু ওটা যত দূরে ঠিক তত দূরেই থাকবে। পথিক হয়ত গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যাবে। সন্দেহ আসবে তার মনে। শেষটায় কোন মোড়ের কাছে বা গাছের ছায়ায় মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গেলে ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে। আসলে কিন্তু এটাও ঘটে আলোর প্রতিসরণের জন্যেই। দিনের সূর্যের তাপে রাস্তা গরম হয়ে পড়ে। সেই উত্তাপটা রাস্তার ঠিক উপরের বাতাসকে উত্তপ্ত করে। রাতে জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে। ঠাণ্ডা থেকে গরম বাতাসে আসবার ফলে ওটা জল থেকে বাতাসে আসবার মতোই (জলভর্তি বালতির কাঠিকে বাঁকা দেখানোর মতো) বেঁকে যায় আর মনে হয় একটা কেউ সাদা কাপড় গায়ে দিয়ে

আগে আগে চলেছে!

এই ধরনের ভুলকে মরীচিকা বলা হয়। মরুযাত্রীরা প্রায়ই মরীচিকা দেখতে পায়। আলোর কারসাজিতে তাদের মনে হয় দূরে ঢেউ তুলে বুঝি কোন নদী বয়ে চলেছে!

অনেক সময় এর উল্টোটাও দেখা যায়। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার সম্বন্ধে গল্প আছে, নাবিকরা অধৈর্য হয়ে পড়েছে, খাদ্য ফুরিয়ে গিয়েছে—সম্মুখে কেবল জল আর জল। কলম্বস তাদের আশ্বাস দিচ্ছেন দেশ আর দূরে নেই। তিনি কেবল আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন বুকে অফুরন্ত আশা নিয়ে। নাবিকরা বিদ্রূপ করে তাকে জিজ্ঞাসা করে: দেশ কি আকাশের গায়ে ফুঁড়ে বেরুবে নাকি!

কলম্বস কিন্তু ঠিকই বুঝেছিলেন। সমুদ্রে দূরের বস্তুর প্রতিচ্ছায়া ঠাণ্ডা-গরম হাওয়ায় আকাশের গায়েও মরীচিকা হয়ে দেখা দেয়!

আগেকার দিনে ঝাড়লণ্ঠনের গায়ে ঝুলত তে-কোণা কাচ। ইংরাজীতে এর নাম প্রিজম। সূর্যের আলো প্রিজমের মধ্যে দিয়ে ঢুকলে সাতটা রং (VIBGYOR) হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। এর থেকে বুঝা যায় সূর্যের যে সাদা আলো তা আসলে কতকগুলি রংয়ের সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

রৌদ্রের মধ্যে বৃষ্টি হয়ে রামধনু দেখা যায়। রামধনু দেখতে হলে সূর্যের দিকে পিছন ফিরে দেখতে হবে। এইভাবে রৌদ্রের মধ্যে মুখে খানিক জল নিয়ে যদি এক বালতি জলে পিচকারীর মতো ঐ জল ছিটিয়ে দাও তাহলেও ঐ বালতির জলে রামধনু দেখতে পাবে। এর থেকেই বুঝতে পারবে লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, বেগুনী, গাঢ় নীল একসঙ্গে মিশেই তৈরী হয় সাদা রং।

সূর্যালোক কতকগুলি বিভিন্ন তরঙ্গের আকারে পৃথিবীতে আসে। সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্যকে লাল মনে হয় বায়ুমণ্ডলের বিশেষ বিশেষ আলোক তরঙ্গের শোষণ বা প্রতিফলনের জন্যেই। এক গামলা জলে কাঠি দিয়ে নাড়লে জলে কেমন ঢেউ ওঠে তোমরা দেখেছ।

আলোরও ঐ রকম তরঙ্গ বা ঢেউ আছে। তবে তারা এত ছোট যে কল্পনা করাও যায় না। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বেশী জলীয় বাষ্প ও ধূলিকণা থাকে। সুতরাং আলোক তরঙ্গের শোষণও এখানে বেশি হয়। কেবল-মাত্র দীর্ঘ তরঙ্গগুলির অর্থাৎ লাল ও হলদে রংয়ের কম ক্ষতি হয়। বাকী রংগুলি শোষিত হয় অথবা সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

বিভিন্ন রংয়ের আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও আলাদা। কোনটা ছোট কোনটা বা বড়। যেমন লাল আলোর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বেগুনী তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের চেয়ে আলাদা। এখানে এক ইঞ্চিতে বিভিন্ন রংয়ের কতগুলি ঢেউ (তরঙ্গ) হয় তার একটা তালিকা দেওয়া গেল—

ঢেউ (এক ইঞ্চিতে)	রং
৭০,০০০	আলট্রা ভায়োলেট (অদৃশ্য)
৬৫,০০০	বেগুনী
৫৫,০০০	নীল
৪৮,০০০	সবুজ
৪৪,০০০	হলুদ
৩৬,০০০	কমলা
৩০,০০০	লাল
২৫,০০০	ইনফ্রারেড (অদৃশ্য)

আচ্ছা এসো এইবার একটা অংক কষা যাক্। একটা লাল আলোর ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য কত হবে বল তো? এ আবার কি শক্ত ব্যাপার! এক ইঞ্চিতে ৩০,০০০ যদি হয় তাহলে একটা তরঙ্গের দৈর্ঘ্য $\frac{১}{৩০,০০০}$ ইঞ্চি লম্বা। উঃ, কত ছোট ভাবতে পার? একবার ভাগ করে দেখবে নাকি?

সূর্যকিরণ সোজা ভাবে পড়লে তাকে অল্প বায়ুস্তর ভেদ করে আসতে হয় আর হেলান দিয়ে পড়লে তাকে বেশী বায়ুস্তর ভেদ করে আসতে হয়। ভোরে এবং সন্ধ্যায় সূর্যরশ্মিকে হেলানো ভাবে সব চাইতে বেশি বায়ুস্তর ভেদ করে আসতে হয়। এই সময়ে সূর্যরশ্মির অন্যান্য রং

সম্পূর্ণভাবে বায়ুমণ্ডলেই শোষিত হয়ে যায়—বাকী লাল ও হলুদ রং শুধু আমাদের কাছে পৌঁছতে পারে। তাই অস্তগামী বা উদীয়মান সূর্যকে লাল দেখায়।

কোন কিছু থেকে আলো বেরুবার কারণ কি তা বলতে পার? তোমরা নিশ্চয়ই জান পরমাণুর মধ্যে আছে নিউক্লিয়াস আর তার চারদিকে ঘুরে চলেছে ইলেকট্রনের দল—ঠিক যে ভাবে সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে বিভিন্ন পথে গ্রহের দল।

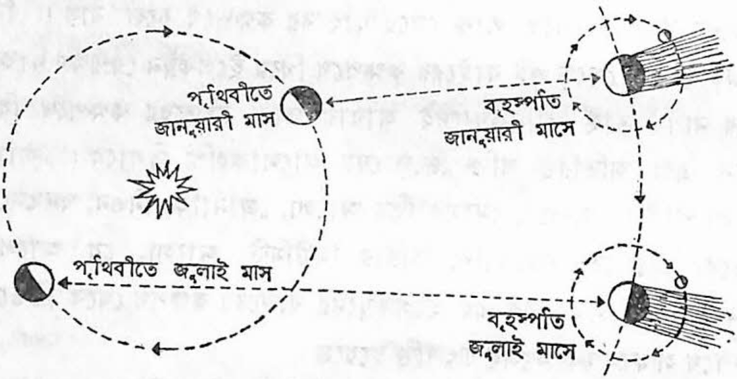
যদি কোনও ভাবে পরমাণুকে উত্তপ্ত করা যায় তাহলে ইলেকট্রন তার ভিতরের কক্ষপথ থেকে লাফ মেরে বাইরের কক্ষপথে চলে যায়। কিন্তু নিজের জায়গা ছেড়ে ওই বাইরের কক্ষপথে গিয়ে ইলেকট্রন বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। তাই খানিকবাদেই আবার তারা ভিতরের কক্ষপথে ফিরে আসে এবং অতিরিক্ত শক্তি ছেড়ে দেয় আলোকরশ্মি হিসাবে। আমরা আলো পাই। আগুন, মোমবাতির আলো, জোনাকি, নিওন, ঘন মেঘের ভিতরের বিদ্যুতের ঝলকানি, তারার মিটিমিটি আলো, যে আলোই আমরা দেখি—সকলেরই এই ইলেকট্রনের বাইরের কক্ষপথ থেকে ভিতরের কক্ষপথে লম্ফঝম্ফের ফলেই উৎপত্তি হয়েছে।

আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত রিলেটিভিটি থিয়োরীতে বলেছেন—আলোক তরঙ্গের গতিবেগের চাইতে বেশী গতিবেগ সম্ভব নয়। আলোকের গতিবেগ সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। অনেক তারার আলো পৃথিবীতে আসতে কয়েক শ' বছর লাগে। সেকেণ্ডে আলোকের গতি-বেগের কথা মনে রেখে ভাবতে পার ঐ সব তারাগুলি পৃথিবী থেকে কত কোটি কোটি মাইল দূরে রয়েছে?

যদি তুমি আলোর গতিবেগের চাইতেও বেশী বেগে ছুটতে পারতে এবং হঠাৎ যেতে থেমে, তাহলে কি মজাটাই না হোত! অবাক হয়ে পিছন ফিরে দেখতে পেতে তুমি নিজে এগিয়ে আসছ!

১৬৭৫ সালে একজন ড্যানিস জ্যোতির্বিদ, নাম রোমার, আলোর গতিবেগ বার করেন। সেই সময়ে তো আর এখনকার মতো যন্ত্রপাতির

এত সুবিধা ছিল না। তবু রোমার যে আলোর গতিবেগ বার করেছিলেন সেটা মোটামুটি ঠিক বলা যেতে পারে। তিনি পৃথিবী থেকে লক্ষ্য করে-ছিলেন বৃহস্পতি গ্রহের চাঁদের (বৃহস্পতির উপগ্রহের) দৃশ্য অথবা অদৃশ্য হওয়ার সময়টা পুরোপুরি নির্ভর করে বৃহস্পতি এবং পৃথিবীর দূরত্বের উপর। ছবি দেখলেই সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে, কেননা বৃহস্পতি এবং পৃথিবীর দূরত্ব বেশি হলে আলোকরশ্মির পৃথিবীতে আসতে সময় বেশি লাগে। ওদের দূরত্ব কমে গেলে আলোকরশ্মির পৃথিবীতে আসতে সময় কম লাগে।



রোমার আগে থেকেই বৃহস্পতি এবং পৃথিবীর দূরত্ব কখন কতটা বদলে যায় তা জানতেন। কাজেই পৃথিবী থেকে বৃহস্পতির উপগ্রহ চাঁদকে দেখতে পাওয়া বা না পাওয়ার সময়ের পার্থক্যটা জেনে নিয়ে তিনি সহজেই আলোর গতিবেগ কত তা অংক কষে বার করেছিলেন।

সূর্যের আলো প্রিজমের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলে রামধনুর মতো সাতটা রং দেখা যায়। একটা বাটিতে কিছু জল নিয়ে এক টুকরো আয়নার কাঁচ ৪৫ ডিগ্রী হেলান দিয়ে ঐ জলের মধ্যে রাখ। এবার সবশুদ্ধ বারান্দার রোদ্দুরে আনলে দেওয়ালে খুব সুন্দর বর্ণালী (স্পেকট্রাম) দেখতে পাবে। বর্ণালীতে যে রংগুলো দেখতে পাওয়া যায় তারা হচ্ছে বেগুনী, গাঢ় নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে একজন নামকরা বিজ্ঞানী স্যর উইলিয়াম হারশেল সূর্যকিরণের সাত রংয়ের কোন রংটা সবচেয়ে বেশি গরম তা থার্মোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন। স্যর হারশেল দেখলেন বর্ণালীর লাল রংয়ের তাপমাত্রাই সব চাইতে বেশী। তিনি এই পরীক্ষা করবার সময় লাল আলোর উপর একটা থার্মোমিটার রেখেছিলেন।

এছাড়া হারশেল আরও একটা তাজ্জব ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন। সেটা হচ্ছে—ঠিক লাল আলোর উপরে থার্মোমিটারকে না রেখে ঐ আলোর পাশে ওটাকে রাখলেন। সেখানে অবশ্য বর্ণালীর কোন আলোই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু অবাক কাণ্ড! ঐ জায়গার তাপমাত্রা দেখা গেল আরও বেশী। হারশেল অনুমান করলেন ঐ জায়গায় এমন কোনও আলো রয়েছে যা খালি চোখে দেখা যাচ্ছে না। তিনি বললেন লাল আলোর পাশে এই অদৃশ্য আলোর জন্যই থার্মোমিটারটা গরম হয়ে উঠছে। পরবর্তী কালে অবশ্য বিজ্ঞানীরা নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন হারশেলের কথাই সত্যি।

এই অদৃশ্য আলোর নাম 'ইনফ্রারেড' আলো। ইনফ্রা—শব্দটির অর্থ হচ্ছে নীচে। এই আলো বর্ণালীর লাল আলোর ঠিক নীচে থাকে বলে এর নাম ইনফ্রারেড আলো। চোখে এই আলো দেখা যায় না। তবু তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে, বিজ্ঞানীরা এমন ফটোগ্রাফিক ফিল্ম তৈরী করেছেন যার সাহায্যে অন্ধকারে ইনফ্রারেড আলোয় ছবি তোলা যায়। অন্ধকার রাতে চোর এসে দেখল তোমার বাড়ীতে কেউ নেই। নিশ্চিন্তে সমস্ত কিছু লোপাট করে সে পালিয়ে গেল। কিন্তু তুমি ইনফ্রা-রেড ক্যামেরা রেখে গিয়েছিলে ঘরের মধ্যে। তাতে ঐ চোরের সমস্ত ছবি উঠে এসেছে। চোর তার কিছুই টের পায়নি। পরে পুলিশ তাকে নিশ্চয়ই ধরে ফেলবে, সন্দেহ নেই।

বর্ণালীর শেষে রয়েছে ভায়োলেট বা বেগুনী রং। বেগুনী রংয়ের কিছু দূরে আর একটা অদৃশ্য আলো রয়েছে। এই আলোর নাম 'আলট্রা-ভায়োলেট' আলো। তোমরা নিশ্চয়ই আলট্রা-ভায়োলেট

ল্যাম্পের কথা শুনেছ। কোন কোন পোকামাকড় আলট্রা-ভায়োলেট আলো নাকি দেখতে পায়। রবীন্দ্রনাথ ইনফ্রারেড আলোর নাম দিয়েছেন লাল উজানি আলো এবং আলট্রা-ভায়োলেট আলোর নাম দিয়েছেন বেগনীপারের আলো। এক ইঞ্চিতে ৩০,০০০ থেকে ৬৫,০০০ ঢেউ বিশিষ্ট যে সমস্ত আলোক তরঙ্গগুলি আসে সেগুলিই আমরা দেখতে পাই। এমন অনেক লোক আছে যারা আবার বর্ণালীর সব আলো দেখতে পায় না। এদের ইংরাজীতে বলে 'কালার ব্লাইণ্ড'। বাংলায় এর কোনও প্রতিশব্দ আছে কিনা তা আমার জানা নেই। এই সব লোকেরা অনেক সময় ছুটো রংয়ের পার্থক্য বুঝতে পারে না—যেমন লাল আর সবুজ। অবশ্য এদের অন্যান্য রংগুলি দেখতে অসুবিধা হয় না।

আলোকের প্রকৃতিকে যেমন তরঙ্গ তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় তেমনি কণাতত্ত্ব দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায়। দেখা গেছে আলোকরশ্মি কতকগুলি জিনিষ, যেমন সেলেনিয়াম-এর উপর পড়লে তার থেকে বিদ্যুত প্রবাহের সৃষ্টি হয়। মৃদু আলো ঐ বস্তুর উপর পড়লে ক্ষীণ বিদ্যুত প্রবাহ এবং শক্তিশালী আলো পড়লে বেশী বিদ্যুতপ্রবাহ হতে থাকে। আলোর কণাতত্ত্বের সাহায্যেই এটা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বড় হয়ে তোমরা এ সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানবে। এই তত্ত্বে বলা হচ্ছে তুমি আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ছোট ছোট আলোকের কণা ঐ ল্যাম্পের থেকে বেরিয়ে বাইরে আসে। বিজ্ঞানীরা আলোর এই কণার নাম দিয়েছেন—'ফোটন'। তাহলে ভেবে দেখো সূর্য থেকে পৃথিবীর বুকে রোজ কত লক্ষ কোটি 'ফোটন' ছুটে আসছে!

তোমরা যদি এখন হঠাৎ প্রশ্ন করে বস—আলোর তরঙ্গতত্ত্ব আর কণাতত্ত্ব এই ছুটোর মধ্যে কোনটা ঠিক তাহলে অতি বড় বিজ্ঞানীও যে মাথা চুলকোতে থাকবেন তাতে আর সন্দেহ কি? তোমাকে চমকে দিয়ে তিনি হুম করে বলে বসবেন—ছুটোই ঠিক। আলোর গতিপ্রকৃতি দেখে, কখনও মনে হয় এটা তরঙ্গ দিয়ে তৈরী। আবার কখনও মনে হয় আলোকরশ্মি কণা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা তাহলে জানলাম

আলোকরশ্মি কণা এবং তরঙ্গ দু' ভাবেই থাকতে পারে।

১৯৬০ সালে বিজ্ঞানীরা এক নতুন ধরনের আলো তৈরী করে সারা দুনিয়ার লোকদের তাক লাগিয়ে দিলেন। এর নাম কি জান? এই আশ্চর্য আলোর নাম 'লেসার রশ্মি'।

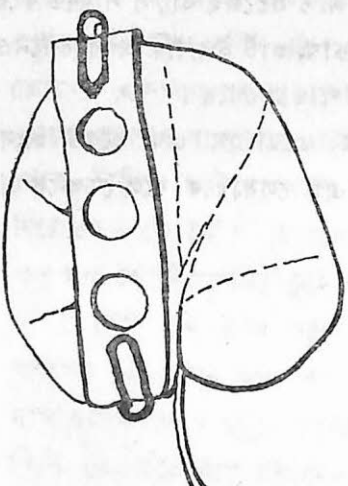
লেসার রশ্মি কি? লেসার হচ্ছে এমন আলো যার মধ্যে ইনফ্রারেড রশ্মি থেকে শুরু করে চোখে দেখতে পাওয়া যায় এমন আলোর সব তরঙ্গগুলিই রয়েছে। এই লেসার আলো অন্য যে কোনও আলোকের চাইতে প্রায় হাজার গুণ বেশী শক্তিশালী। এই লেসার রশ্মিকে পৃথিবী থেকে অনায়াসে চাঁদের বুকে পাঠিয়ে আবার তার প্রতিফলিত আলোককে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

এই আশ্চর্য রশ্মির সাহায্যে এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ে একটা ষ্টীল প্লেটের ভিতর নিখুঁত একটা গর্ত করা যায়। এছাড়া আজকাল দূরে, তা সে যত দূরেই হোক না কেন, এই লেসার রশ্মির সিগনাল পাঠিয়ে কত অজানা তথ্য জানা যাচ্ছে। হীরে এবং টাংস্টেনের মতো বস্তুকে এই লেসার রশ্মি অতি সহজেই বাষ্পে পরিণত করে দিতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে জটিল চোখ, হার্ট ইত্যাদি অপারেশনেও এই লেসার রশ্মি ব্যবহার করে প্রচুর সুফল পাওয়া গেছে।

এই লেসার আলো ছুঁড়ে আবার এরোপ্লেন এবং রকেট ধ্বংস করাও সম্ভব হচ্ছে আজকাল। তখন এই লেসারকে বলে ডেথ-রে বা মরণরশ্মি।

সালোকসংশ্লেষের মজার খবর

বললে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তবু বলছি প্রত্যেক গাছের ভিতর আস্ত একটা ল্যাবরেটরী লুকিয়ে আছে। এই লুকানো ল্যাবরেটরী থেকে গাছ এমন সব জিনিষ নিজেই তৈরী করতে পারে যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এ ব্যাপারে তারা মানুষের তৈরী সবচাইতে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিওয়ালা ল্যাবরেটরীকেও টেক্কা দিয়েছে। মাটি থেকে জল এবং খনিজ লবণ টেনে নিয়ে বাতাসের সংস্পর্শে গাছ চিনি, স্টার্চ, সেলুলোজ এবং চর্বিজাতীয় পদার্থ তৈরী করে। যেহেতু আলো এই প্রক্রিয়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে তাই এই ঘটনাকে বলা হয় 'ফটোসিনথেসিস' বা সালোকসংশ্লেষ। প্রত্যেকটি গাছ তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, যেন একটি ক্ষুদে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী— যেমনি জটিল, ঠিক তেমনিই বিস্ময়কর।

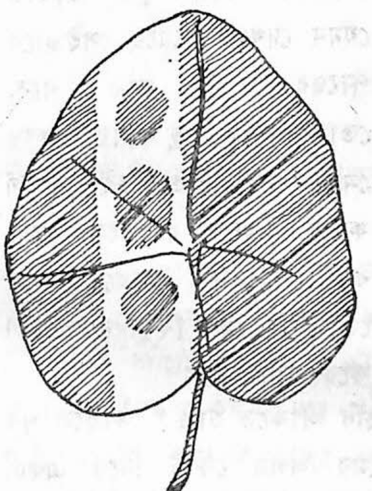


গাছের পাতায় ক্লোরোফিল বলে একটা জিনিষ থাকে। সেইজন্যেই পাতাকে সবুজ দেখায়। ফটোসিনথেসিসের সময় পাতার ক্লোরোফিল সূর্যকিরণের সাহায্যে জল এবং বাতাসের বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রথমে চিনি এবং পরে স্টার্চ তৈরী করে। আলো যে এর জন্য কত দরকারী একটা পরীক্ষা করে তা সহজেই বুঝা যায়।

মোটা পাতা আছে এমন যে কোনও একটা টবের গাছকে কয়েকদিন অন্ধকারে রাখ। তারপর ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেই রকম এক

ফালি কালো কাগজ কেটে গোল গোল ফুটো করে চার-পাঁচটা পাতাকে দু'পাশ মুড়ে নিয়ে ক্লিপ দিয়ে আটকে দাও। গাছটাকে বেশ কয়েক ঘন্টা রোদ্দুরে রাখ। যে সব পাতাগুলিকে ঢেকে রেখেছিলে তাদের ছিঁড়ে নাও। এবার পাতার কাগজ ও ক্লিপ খুলে ফেলে পাতাগুলিকে এক মিনিট গরম জলে ডুবিয়ে রাখ। এখন মেথিলেটেড স্পিরিটের একটা ছোট্ট বাটিতে পাতাগুলিকে ডুবাও। স্পিরিটের ঐ বাটিকে এবার ফুটন্ত জলের একটা বড় বাটির উপর বসাও। খুব সাবধানে এটা করবে। দেখবে, যেন আগুনের শিখা বাইরে বেরিয়ে না থাকে। তাহলে স্পিরিটে আগুন ধরে যেতে পারে। দরকার মনে হলে বড়দের কারও পরামর্শও নিতে পার তোমরা। স্পিরিটের গরম এ্যালকোহলে পাতাগুলোকে সেদ্ধ করা হল কেন বল তো? ক্লোরোফিল পাতা থেকে বেরিয়ে এসে স্পিরিটে গুলে যাবে। তখন দেখবে ভারী মজার ব্যাপার! পাতাটা একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে।

এইবার স্পিরিটের ভিতর থেকে পাতাগুলোকে তুলে নাও। তারপর একটা ডিসে এদের সাবধানে রাখ এবং অল্প জল দিয়ে ধুয়ে নাও।



এবার সামান্য একটু আইয়োডিন দ্রবণ (তৈরী করে নেবে এক ভাগ টিংকচার আইয়োডিনের সাথে দশ ভাগ জল মিশিয়ে) ঐ পাতায় ঢাল। পাতার যে অংশ সূর্যের আলো পেয়েছে সে জায়গাটা সঙ্গে সঙ্গে নীল হয়ে যাবে। এর থেকে বুঝা যায় ঐ জায়গায় স্টার্চ তৈরী হয়েছিল। কিন্তু পাতার ঢাকা অংশের জায়গায় নীল রং দেখা যাবে না। কেননা সেখানে স্টার্চ তৈরী হতে

পারেনি। সূর্যের আলো তাহলে পাতায় স্টার্চ তৈরীর জন্য কত দরকারী তা তোমরা এবার বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়।

বৈজ্ঞানিক মজা

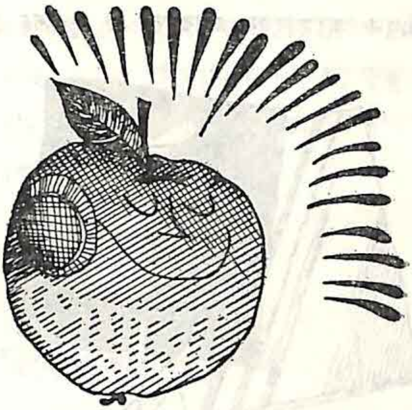
একটা আস্ত বড় পেয়ারাকে যদি ছোট্ট-মুখওয়ালা বড় বোতলের মধ্যে দেখা যায় তাহলে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে—নয় কি? সবাই অবাক হয়ে ভাববে পেয়ারাটা বোতলের মধ্যে ঢুকল কেমন করে! কিন্তু এর পিছনের বৈজ্ঞানিক মজাটা কোথায় লুকিয়ে আছে বলতে পার? আসলে কিন্তু পেয়ারাটা বড় হয়েছে ঐ বোতলের মধ্যেই!

পেয়ারা গাছের একটা ছোট্ট ডালকে (যার মধ্যে সবেমাত্র পেয়ারা ধরেছে) আস্তে করে একটা বোতলের মধ্যে পুরে ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে সেইভাবে গাছের সঙ্গে বেঁধে দাও। ব্যস, তোমার আর কিছু করার দরকার নেই—বাকীটা প্রকৃতিই সম্পূর্ণ করবে। অবশ্য বোতলের মধ্যে বড় পেয়ারাকে দেখতে হলে তোমাকে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে।



পেয়ারার উপর কোনও নাম বা ছবি আঁকতে চাও? তাহলে খুব পাতলা এলুমিনিয়ামের পাত থেকে নামের অক্ষর কেটে নিয়ে একটা ডাঁসা বড় পেয়ারার গায়ে পেট্রোলিয়াম জেলী অথবা ওয়াটারপ্রুফ কোনও আঠা দিয়ে আটকে দাও। লক্ষ্য রাখবে ফলের যে দিকটায়

পাতাটা লাগানো সেটা সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। সূর্যের আলোয় পেয়ারার খোসা হলুদ রং ধারণ করে। কিন্তু পেয়ারার যে অংশ ঢাকা থাকবে সেখানে সূর্যের আলো ঢুকতে পারছে না। কাজেই সে জায়গাটায় কোনও রংয়ের বাহার থাকবে না। পেয়ারাটা পেকে গেলে ওটাকে পেড়ে পাতাগুলো ফেলে জল দিয়ে ধুয়ে ফেল। চমৎকার ভাবে অক্ষরগুলো দেখতে পাবে—মনে হবে ঠিক যেন সূর্যকিরণ এসে সই করে দিয়ে গেছে ঐ ফলের গায়ে !



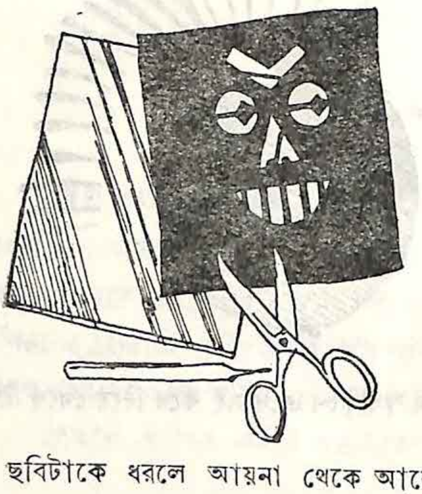
ভূতের ছায়া

সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোলের ছড়া বাংলাদেশের কোন ছেলে-মেয়ে পড়েনি ?

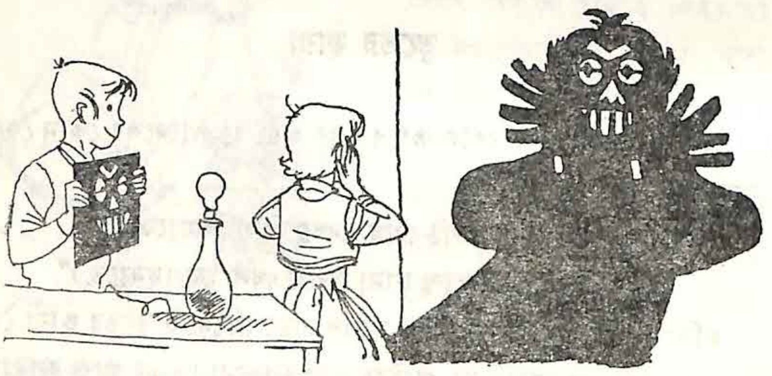
> "পরশু রাতে স্পষ্ট দেখি, দেখনু বিনা চশমাতে,
> পান্ত ভূতের জ্যান্ত ছানা করছে খেলা জ্যোছনাতে।"

সত্যি সত্যি কিন্তু আমরা এই মজার এক্সপেরিমেণ্টে ভূতের ছায়া তৈরী করে সব্বাইকে একেবারে ভয় পাইয়ে তবে ছাড়বো ! এর জন্যে আমাদের চাই—একটা পরিষ্কার বাল্‌ব শুদ্ধ টেবিল ল্যাম্প, একটা আয়না, একটা কার্ডবোর্ডের সীট অথবা ঐ ধরনের মোটা কাগজ, একজোড়া কাঁচি, একটা ধারাল ব্লেড অথবা ছুরি।

যদি এবার কেউ টেবিল ল্যাম্প এবং দেওয়ালের মাঝখানে দাঁড়ায় (ছবিতে আঁকা মেয়েটার মতন) তাহলে ভূতের ছায়া দেখা যাবে নিশ্চয়ই। এখন আমাদের দরকার ঐ ভূতের চোখ, নাক, দাঁত এইসব তৈরী করা।



এগুলোও করা বিশেষ কঠিন নয়। একটা কার্ডবোর্ডের উপর প্রথমে ভূতুড়ে চোখ, নাক, দাঁত ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইরকম এঁকে নাও। তারপর ছুরি অথবা ব্লেডের সাহায্যে গর্ত করে ঐ জায়গাটা কেটে নিতে হবে। এইবার ছবিটাকে আয়নার উপর ভাল করে বসাও। এইবার ল্যাম্পের ঠিক পিছনে আয়নাশুদ্ধ ছবিটাকে ধরলে আয়না থেকে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে দেওয়ালে ভূতের ছায়া পড়বে। ভূতের ছায়া স্পষ্ট হবে বেশি যদি কার্ডবোর্ডের



কাগজের রংটা গাঢ় হয়। খয়েরী রংয়ের কাগজেই সব চাইতে ভাল ফল পাওয়া যায়।

দুটো আয়নার উপর ভূতের ছবি আটকিয়ে এই ভূতুড়ে ছায়াকে আরও

আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। একটা আয়নায় থাকবে ভূতের চোখের ছবি আর অন্য আয়নায় ভূতের নাক ও দাঁত আঁকা থাকবে। ছুটো আয়নাকেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমন ভাবে দেখাতে হবে যেন মনে হয় ভূতের চোখ ছুটো নাক এবং দাঁত থেকে উঠে আসছে। কি সাংঘাতিক ভয়ংকর ভূতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার, তাই না ?···কি, তুমি হাসছ! ভাবছ, বুঝি আলো-ছায়ার খেলা এটা। তা ভাবতে পার—আপত্তি নেই আমার।

সাত রং মিশে এক রং

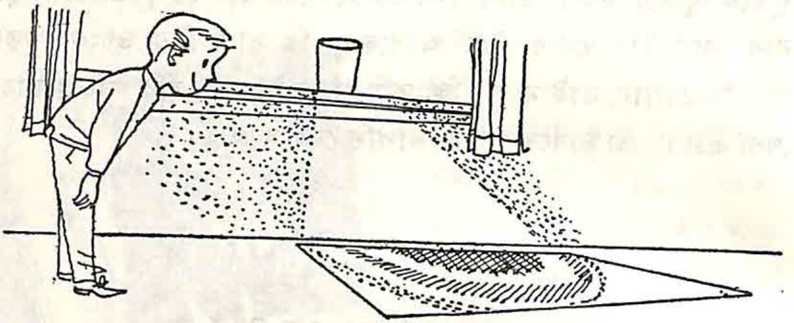
অংক শাস্ত্রে ৭=১ এই নিয়মটা নিশ্চয়ই খাটে না। তবু পদার্থ-বিদ্যায় আলোর গতিবিধি সম্পর্কে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁরা বলবেন আলোর সাত রং একসাথে মিশে গেলে সাদা রং দেখা যাবে।

একটা বাটিতে কিছু জল নিয়ে তার মধ্যে একখণ্ড আয়নার ভাঙা কাচ ৪৫ ডিগ্রী কোণ করে রোদ্দুরে রাখ। দেওয়ালে চমৎকার রামধনু দেখতে পাবে। দরকার হলে কাচটাকে একটু এদিক-ওদিক নড়িয়ে দেবার দরকার হতে পারে ভাল রামধনু রং পাবার জন্য। সূর্যের সাদা রং আসলে যে সাতটা রংয়ের সংমিশ্রণে তৈরী তা এবার বুঝা গেল। জানালার বাইরের দিকে একগ্লাস জল রেখেও রামধনু দেখা যেতে পারে। মেঝের উপর সাদা কাগজ রাখলে রামধনুটা পরিষ্কার দেখা যাবে।



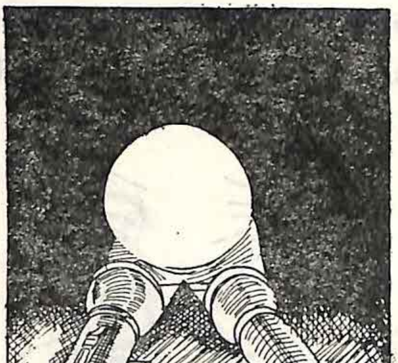
ঐ সাত রংকে একটা লেন্স দিয়ে ফোকাস করে আবার সাদা রং-এ

পরিণত করা যায়। প্রিজমের সাহায্যে সূর্যের সাত রং বিশ্লেষণ করা খুবই সহজ। কিন্তু প্রিজম জোগাড় করা সব সময় সম্ভব নয়। তাই জলের



মধ্যে আয়নার টুকরো রেখে এই কাজ সারা যায়।

আরো একটা মজার এক্সপেরিমেন্টের কথা এবার বলছি। দুটো টর্চ নাও। একটা টর্চের মুখে নীল সেলোফিন কাগজ ও অন্য টর্চে হলুদ সেলোফিন কাগজ আটকিয়ে রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে আটকে দাও। টর্চ দুটো জ্বালিয়ে দেবার পর দেখতে পাবে একটা থেকে নীল ও অপরটা থেকে হলুদ আলো বেরোচ্ছে। এবার ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে ঠিক সেইভাবে টর্চ দুটোকে রেখে ওই দু' রংয়ের আলো একটা সাদা কাগজে অথবা কার্ডবোর্ডের একই

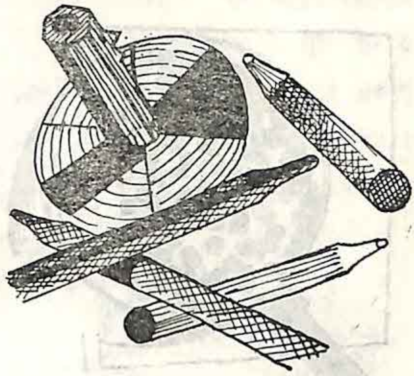


জায়গায় ফোকাস কর।

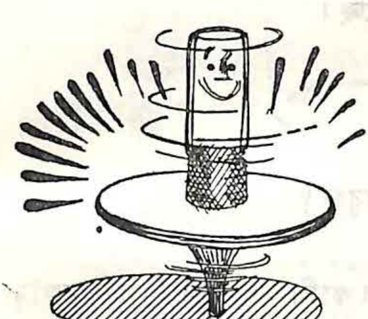
নীল ও হলুদ আলো ঐ সাদা কাগজের উপর পড়ে মিশে যাবে এবং সাদা দেখাবে। যদি কোন টর্চের আলোর জোর বেশী হয় তাহলে কিন্তু

সেই সেলোফেন কাগজের রংটা দেখা যাবে। এইজন্যে লক্ষ রাখবে দুটো টর্চের ব্যাটারীই যেন নতুন হয়।

তুমি টর্চের মুখে হলুদ ও নীল ছাড়া অন্য রংয়ের সেলোফেন কাগজ মুড়েও দেখবে বেশীর ভাগ দুটো রং মিশে গেলে সাদা দেখাচ্ছে।



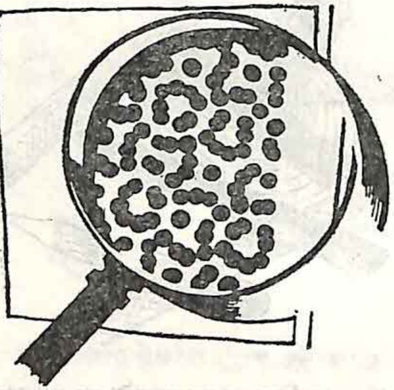
নিউটন সাতটা বিভিন্ন রং মিশে গেলে যে সাদা দেখায় তা একটা সহজ এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখিয়েছিলেন। যন্ত্রটির নাম—'নিউটন রোটেটিং ডিস্ক'। একটা গোল চাকতির গায়ে সাতটা রং মাখান ছিল। চাকতিটি স্থির থাকলে তার সব রংই পরিষ্কার চোখে পড়ে। চাকতিটি জোরে ঘুরিয়ে দিলে কিন্তু সাত রং বেমালুম উধাও হয়ে যায় আর মনে হয় সাদা রংয়ের একটা চাকা ঘুরছে!



নিউটনের চাকতির মতো একটা জিনিষ আমরা সহজেই তৈরী করতে পারি। একটা পিচবোর্ড গোল করে কেটে নিয়ে তার মাঝখানে ছুরি দিয়ে একটা ফুটো কর। ঐ ফুটোর মধ্যে যেন একটা মোটা পেন্সিল সহজেই ঢুকতে পারে। এইবার পিচবোর্ডে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে সাতটা রং তুলি অথবা রঙীন পেন্সিল দিয়ে আঁকো। পেন্সিলের মুখকে নীচে রেখে জোরে ঘুরিয়ে দিলেই দেখবে সাত রং বেমালুম ভ্যানিস এবং সাদা দেখাচ্ছে ওটাকে। একটা লাট্টুর উপরে সাত রং এঁকে নিয়ে লাট্টুটাকে ঘুরালে দেখবে ওটা ঘুরবার সময়

সাদা দেখাচ্ছে।

চারটে রং একসাথে মিশিয়ে সব রং পাওয়া যেতে পারে। বই এবং ম্যাগাজিনে তোমরা যে সব রঙ্গীন ছবি দেখতে পাও সেগুলো



সাধারণত লাল, হলুদ, নীল এবং কালো কালি দিয়ে ছাপা হয়। ঐ রকম আর্ট প্লেটে ছাপানো কোন রঙ্গীন ছবিকে শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলে হলুদ, কালো, লাল এবং নীল খুব ছোট ছোট বিন্দু দেখতে পাবে। তুমি নিজেও চেষ্টা করে দেখতে পার লাল, হলুদ, নীল ইত্যাদি রং মিশিয়ে কি ধরনের রং তৈরী হচ্ছে।

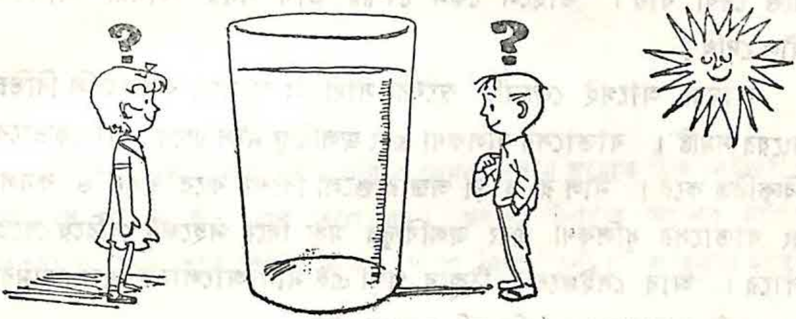
লাল অথবা সবুজ?

এক গেলাস জলের মধ্যে একটু লাল কালি অথবা মারকিউরোক্রোম মিশিয়ে তার রংটা কেমন দেখাবে—লাল না সবুজ?

তুমি অবশ্য বলতে পার ঐ জলের রং হবে লাল না হয় গোলাপী। আচ্ছা এবার এসো আমরা চেষ্টা করে দেখি ওর রংটা সত্যি সত্যি কেমন হবে। একগ্লাস জলের মধ্যে কয়েক ফোঁটা লাল কালি ঢেলে ভাল করে মেশাও। এখন গ্লাসটাকে রোদ্দুরে আনো। লক্ষ রাখবে আলো যেন তার পিছনদিকে থাকে।

এবার গ্লাসের মধ্য দিয়ে চাইলে কি রং দেখতে পাবে? সন্দেহ নেই, রংটা গোলাপী। কিন্তু গেলাসটাকে আলো থেকে দূরে সরিয়ে এনে দেখ।

কি দেখতে পাচ্ছ? তাজ্জব ব্যাপার, সবুজ রং—তাই না! ব্যাপারটা ঘটছে এইজন্যে যে প্রথমবারে তুমি বিচ্ছুরিত আলো দেখেছ এবং পরের বার প্রতিফলিত আলো এসে তোমার চোখে পড়েছে। এই এক্সপেরিমেণ্ট সব লাল কালিতে ভাল হয় না, তবে মারকিউরোক্রোম দ্রবণে খুব সুন্দর দেখায়। মারকিউরোক্রোমের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই তোমরা—এটা একটা রঞ্জক পদার্থ; দূষিত অথবা ক্ষত স্থানে ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মারকিউরোক্রোম খুব বেশী জলে ঢালবার দরকার নেই। ১% থেকে ৫%



দ্রবণের সাহায্যে লাল রং থেকে সবুজ রংয়ের পরিবর্তন স্পষ্ট চোখে পড়বে।

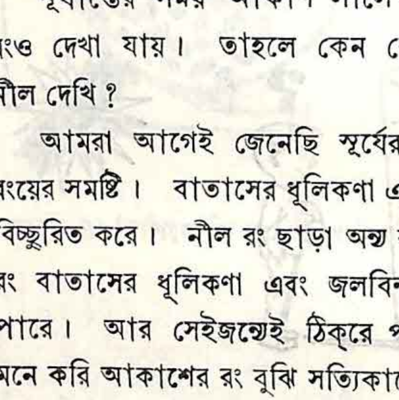
মারকিউরোক্রোম দিয়ে অন্যভাবেও এই সুন্দর এক্সপেরিমেণ্টটা করা যায়। একটা শুক্‌নো ছোট্ট কাচের গেলাসের মধ্যে কয়েক ফোঁটা মারকিউরোক্রোম ঢাল। কিছুক্ষণ রেখে দেবার পর দেখবে ওটা শুকিয়ে এসেছে। গেলাসটাকে অনুভূমিক অবস্থায় রেখে (Horizontally) আলোর দিকে তুলে ধরে নীচ থেকে দেখ। লাল রং দেখতে পাবে। এবার গেলাসটাকে এমন ভাবে উল্টিয়ে দাও যাতে ঐ লাল রং তির্যক কোণ থেকে আলো প্রতিফলিত করতে পারে। কি আলো চোখে পড়বে এবার? নিশ্চয়ই সবুজ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আকাশ নীল কেন?

কোনটা ঠিক্—আকাশের রং নীল না আকাশকে নীল দেখায়? আকাশকে নীল দেখায়, এই কথাটাই ঠিক। মহাকাশচারীগণ কৃত্রিম উপগ্রহতে চড়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবার সময় আকাশের নীলাভ-কালো রং দেখতে পেয়েছেন।

সূর্যাস্তের সময় আকাশ লালে লাল দেখায়। কখনও আবার হলুদ রংও দেখা যায়। তাহলে কেন বেশীর ভাগ সময় আমরা আকাশ নীল দেখি?

আমরা আগেই জেনেছি সূর্যের সাদা রং আসলে কতকগুলি বিভিন্ন রংয়ের সমষ্টি। বাতাসের ধূলিকণা এবং জলবিন্দু নীল রংকে ব্যাপকভাবে বিচ্ছুরিত করে। নীল রং ছাড়া অন্য রংগুলো বিশেষ করে হলুদ ও কমলা রং বাতাসের ধূলিকণা এবং জলবিন্দুর মধ্য দিয়ে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে। আর সেইজন্যেই ঠিক্‌রে পড়া এই নীল আলোকে দেখে আমরা মনে করি আকাশের রং বুঝি সত্যিকারের নীল।

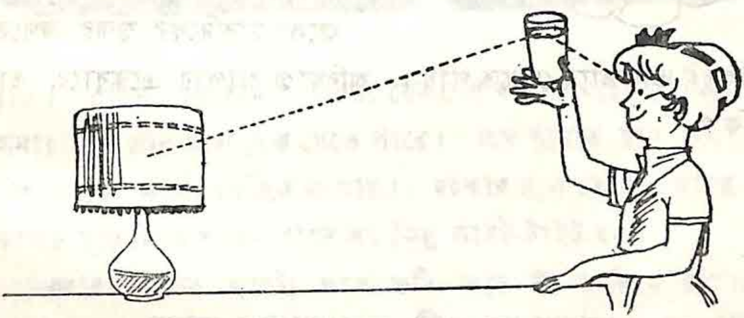


অন্য রংগুলোর চাইতে নীল রং যে সহজেই বিচ্ছুরিত হয় তা একটা ভারী সুন্দর মজার এক্সপেরিমেণ্ট করে প্রমাণ করা যায়। একগ্লাস জলের মধ্যে কয়েক ফোঁটা দুধ ফেলে একটা চামচ দিয়ে নেড়ে দাও। দুধের কণাগুলো এখানে বায়ুর ভিতরের ধূলিকণা অথবা জলবিন্দুর মতো কাজ করবে। এবার গেলাসটাকে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে তার ভিতরে ছবিতে

যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক সেইভাবে টর্চের আলো ফেল। এখন গেলাসের একপাশ থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির সমকোণে ঐ আলোর দিকে তাকাও। গেলাসের ঐ তরল দুধকে কিন্তু মোটেই সাদা দেখাবে না। কেমন দেখাবে বল তো? কেমন আবার! নীলাভ নিশ্চয়ই, কারণ—দুধের কণাগুলো নীল আলোকরশ্মিকে অন্যদের চাইতে সহজেই বিচ্ছুরিত করে দেবে।

পারার মতো জল

একগ্লাস জল নিয়ে সেটা ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে ঠিক সেইভাবে তোমার সামনে উঁচু করে তুলে ধর। জলের উপরের অংশের নীচের দিকটাকে মনে হবে রূপো অথবা পারা দিয়ে তৈরী। আয়নার মতো



দেখতে জলের ঐ অংশ দিয়ে তুমি একটা টেবিল-ল্যাম্প দেখার চেষ্টা করতে পার। লক্ষ রাখবে গেলাসের জল যেন বেশী নড়াচড়া না করে—তাহলে জলের আয়নাও নড়তে থাকবে।

নীচ দিয়ে তাকালে জলের আচ্ছাদনকে আয়নার মতো মনে হয় কেন বলতে পার? আসলে আলো কোণাকুণি ভাবে জল থেকে বাতাসে

বেরিয়ে আসবার সময় যদি খুব বেশী তীর্যক ভাবে পড়ে তাহলে ঐ আলো আর বাতাসে পৌঁছতে পারে না। ঐ আলো প্রতিফলিত হয়ে জলের মধ্যেই ফিরে আসে। তারপর গেলাসের কাচের মধ্যে দিয়ে বাইরের বাতাসে এসে তোমার চোখে পড়ে। তখন ওটাকে আয়নার মতো মনে হয়।

জলের নীচে সাঁতার কাটার সময় হয়ত লক্ষ করেছ কোণাকুণি জলের উপরের দিকে তাকাতে চাইলে তাকান যায় না—তা সে জল যত পরিষ্কারই হোক না কেন। অবশ্য জলের নীচে সাঁতার কাটবার সময় মানুষের চোখেই এই রকম ব্যাপার ঘটে—মাছেদের নয় কিন্তু! মাছেরা আলোর এই রকম প্রতিফলন বোধহয় মোটেই পছন্দ করে না। তারা তো জলের চারদিকের সুন্দর জগতের সব কিছুই ভালভাবে দেখতে পায়। অবিশ্বাস্য ব্যাপার একেবারে, তাই নয় কি?



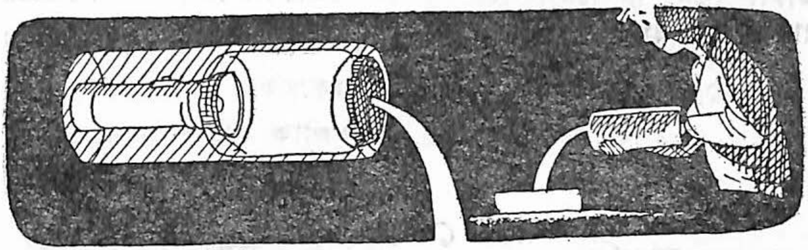
আলো হল বন্দী, জলস্রোতের জালে

আমরা দেখলাম, আলো উঁচু হয়ে জলের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় তীর্যক ভাবে ধাক্কা খেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। তার বদলে আলো ঠিক আয়নার মতো প্রতিফলিত হয়ে আবার জলের মধ্যেই ফিরে আসে। এই মতলবটা কাজে লাগিয়ে এসো এবার আমরা আলোকরশ্মিকে

বেঁকানো জলস্রোতের পিছনে ছুটিয়ে দিই। তার মানে এখানে ঐ জলস্রোতের মধ্যে আলোকরশ্মি বন্দী হল! ঐ জলস্রোতের জালে পড়ে আলো কিছুতেই তার মধ্যে থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

এই মজার এক্সপেরিমেণ্টটা করতে হলে আমাদের চাই একটা ছোট টর্চ, একটা ছোট কাচের জ্যাম জার (ঢাকনা-সহ) আর কিছু ব্রাউন পেপার।

কাচের জারের ঢাকনিটার মুখে দুটো ফুটো করতে হবে। ঢাকনির মাঝখানের ফুটোটা হবে বড় আর পাশের ফুটোটা হবে ছোট—(ছবি দেখ)। জ্যাম জারটাকে বেশ ভালো করে ব্রাউন পেপার দিয়ে মুড়ে

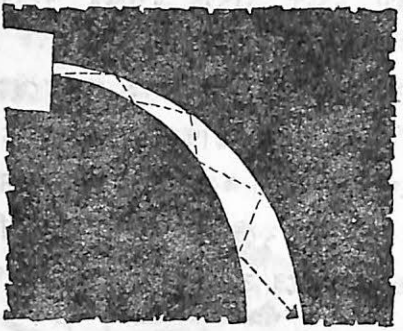


দাও। ব্রাউন পেপারের মোড়কটা যেন বেশ বড় হয় যাতে তোমার টর্চটা অনায়াসেই তার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। লক্ষ রাখতে হবে যেন পিছন দিক থেকে আলো বেরিয়ে না যায়। দরকার হলে তোমার হাতে একটা কাপড় মুড়ে নিতে পার—যাতে সব কিছু লাইট-টাইট হয়।

এবার কাচের জারটা জলে ভর্তি করে টর্চ জ্বালিয়ে জারের মুখ সামান্য কাত করে বেসিনের কাছে নিয়ে এস। ঘরের আলো নিভিয়ে দাও অথবা দিনের বেলা হলে জানালা দরজা বন্ধ করে দাও। তোমার একটা আঙুলকে গর্তের কাছাকাছি ঐ জলস্রোতের মধ্যে রাখ। দেখবে আলো এসে তোমার আঙুলে পড়েছে। এবার আঙুলকে বেঁকানো জলস্রোতের দিকে আস্তে আস্তে সরাও। দেখবে অবাক কাণ্ড, আলো কিন্তু তখনও তোমার আঙুলে পড়ছে যদিও জলস্রোতটা বেঁকে গিয়েছে

নব্বই ডিগ্রীতে।

দ্বিতীয় ছবিতে কিভাবে আলো বারে বারে প্রতিফলিত হয়ে জল-



স্রোতের জালে বন্দী হয়েছে তা দেখানো হয়েছে।

ঠিক এই রকম মতলব খাটিয়ে আলোকরশ্মিকে বেঁকানো কাচ অথবা প্লাস্টিকের টিউবের মধ্যে দিয়ে পাঠানো যায়। আর এই উপায়ে আলোর ভেল্কি বাজি দেখিয়ে রাস্তায় চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বড় হয়ে তোমরা তা জানবে।

আলো দেখতে পাওয়া

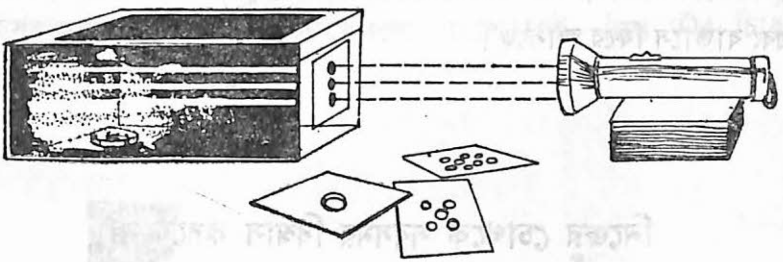
আলো দেখতে পাওয়া! কথাটা শুনে তোমাদের অবাক লাগছে নিশ্চয়ই। আলো তো সব সময়েই দেখতে পাওয়া যায়—তাই নয় কি? না—আলো কখনই দেখা যায় না। যে উৎস থেকে আলো আসছে, যেমন—মোমবাতি, বিজলীবাতি অথবা সূর্য, সেটাই আমরা দেখতে পাই। এই সমস্ত উৎস থেকে নির্গত আলোকরশ্মি যখন কোনও বস্তুর উপর পড়ে প্রতিফলিত হয় অথবা ছড়িয়ে পড়ে তখন আমরা তাদের দেখতে পাই। কিন্তু আলোকরশ্মিকে আমরা কখনও দেখতে পাই কি? একবার ভালো করে ভেবে দেখ তো! আসলে এই এক্সপেরিমেন্টের নামকরণ 'আলো দেখতে পাওয়া' কথাটাই তাহলে ভুল—কি বল? আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম—আলোকরশ্মির পথকে কি ভাবে দেখতে পাওয়া যেতে পারে। খুব সহজ একটা এক্সপেরিমেন্ট করেই এটা বুঝা যায়।

আলোকরশ্মি যখন ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভাসমান কণায় ধাক্কা মেরে এগিয়ে যায় তখন সত্যি সত্যি আলোকে আমরা দেখতে পাই।

সত্যিকারের আলোকরশ্মি দেখতে হলে আমাদের বিশেষ কিছু যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন হবে না। তোমাকে শুধু জোগাড় করতে হবে একটা মজবুত জুতোর বাক্স, একখণ্ড কাচ, কালো রং ও একটা টর্চ।

প্রথমে জুতোর বাক্সর ঢাকনা থেকে আয়তাকার ভাবে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেই রকম ভাবে কেটে নাও। ঐ কাটা অংশটায় মাপমতো কাচ কেটে নিয়ে (মাপ নিয়ে বাজার থেকে কাটিয়ে আনতেও পার) বসিয়ে দাও। এইবার আঠা দেওয়া পলিথিনের ফিতে (এ্যাডেসিভ টেপ) দিয়ে ঐ কাচের চারদিক আটকে দাও। ওটা পাওয়া না গেলে সাধারণ পাতলা কাগজে আঠা লাগিয়ে কাচের চারদিক মুড়ে দিতে পার।

এরপর বাক্সর একদিকের দেওয়াল বর্গাকার করে কেটে নাও। বাক্সের ভেতরে কালো কালি দিয়ে (ভেতরের দিকের কাচেও) রং কর।

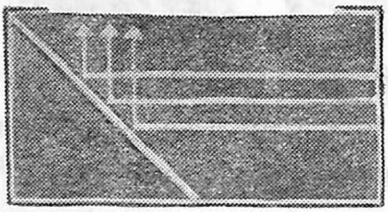


বাক্সর যে জায়গাটা বর্গাকার করে কেটে নেওয়া হয়েছে সেখানে শক্ত ভাবে ফিট করে এমন কয়েকটি কার্ড কেটে নাও। একটি কার্ডের মাঝখানে গোল করে ½ ইঞ্চি গর্ত কর। অন্য আর একটি কার্ডে ছবিতে দেখানো হয়েছে সেই রকম তিনটি ও অন্যটিতে পাঁচটি গর্ত কর।

এক্সপেরিমেণ্ট করবার সময় অবশ্য তোমার ঘরকে একেবারে অন্ধকার করে দিতে হবে। বাক্সর বর্গাকার জানালার প্রায় একগজ দূরে, টর্চকে এমন ভাবে রাখবে যেন আলোকরশ্মি ছবিতে যেমন করে দেখানো হয়েছে

সেইভাবে পড়তে পারে। এখন একটা ছোট্ট টিনের কৌটোর ঢাকনায় আধ জ্বলন্ত পচা কাঠের টুকরো অথবা সিগারেটের শেষ অংশ রেখে দিলে তার থেকে ধোঁয়া বেরুতে থাকবে। তুমি পরিষ্কার আলোকরশ্মিকে দেখবে এবং আলো কেমনভাবে সরলরেখায় চলে তাও বুঝতে পারবে।

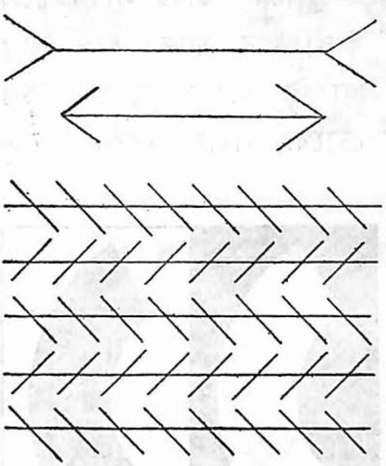
প্রতিফলন এবং প্রতিসরণের ঘটনাও চমৎকার ভাবে এই বাক্সর সাহায্যে দেখানো যায়। এর জন্য বাক্সর একেবারে শেষপ্রান্তে ৪৫° কোণ করে একটা কাচের আয়না রাখ। তুমি অবাক হয়ে দেখবে আপতিত কোণ এবং প্রতিফলিত কোণ সমান। প্রতিসরণ দেখবার জন্যে তুমি বাক্সর মধ্যে একটা বোতল রেখে তার মধ্যে কিছু জল ও কয়েকফোঁটা দুধ ঢাল। দেখবে, প্রতিসরিত আলোর গতিপথ কেমন সুন্দরভাবে বাতাস, কাচ এবং জলের ভিতর দিয়ে ঢুকে আবার জল, কাচ এবং বাতাসে ফিরে আসছে!



নিজের চোখকে সবসময় বিশ্বাস করবে না

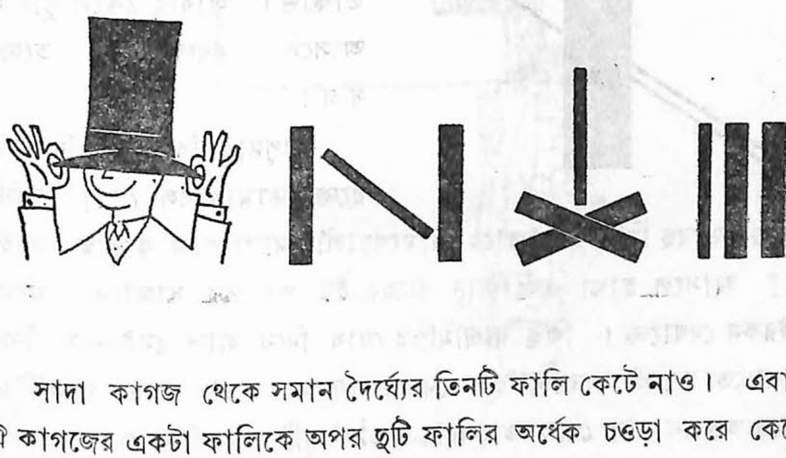
নিজের চোখকে আমরা সকলেই দারুণ বিশ্বাস করি। এত বিশ্বাস করি যে নিজের চোখে কোনও কিছু ঘটতে দেখলে আমরা কখনই তা অসত্য বলে মনে করতে পারি না। অথচ চোখেরও দেখা যায়, কখনও কখনও বেশ বিভ্রম ঘটে। অনেক অসত্য জিনিষ তখন দৃষ্টিতে হুবহু সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। ইংরাজীতে একে বলে 'অপ্‌টিক্যাল ইলিউসন'; বাংলায়—চোখের ধাঁধা। এইসব চোখের ধাঁধা দেখতে অবশ্য ভারী মজা লাগে। এদের কোন কোনটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কোনটির আবার

কোনও ব্যাখ্যাই দেওয়া যায় না। চোখের ধাঁধার পাল্লায় পড়লে ছোট বড় সবাইকেই হতবুদ্ধি হয়ে যেতে হয়।



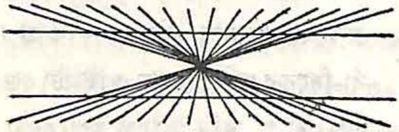
এবার এসো, আমরা কয়েকটা চোখের ধাঁধার দিকে তাকাই। বাঁ-দিকের ছবির কোন্ লাইনটা বড় বল তো? তুমি ভাবছ উপরেরটা নিশ্চয়ই। একবার ভাল করে মেপে দেখলেই মজাটা বুঝতে পারবে। আসলে দুটো লাইনই সমান। তীর চিহ্নের জন্যেই চোখে এইরকম ধাঁধা লাগছে।

আচ্ছা এবার দেখ—বাঁ-দিকের উপরের অন্য লাইনগুলো সমান্তরাল মনে হচ্ছে কি? তুমি মনে করতে পার লাইনগুলো অসমান্তরাল। আসলে লাইনগুলো সমান্তরালই—কিন্তু তীর চিহ্নের জন্যই ঐ রকম দেখাচ্ছে।

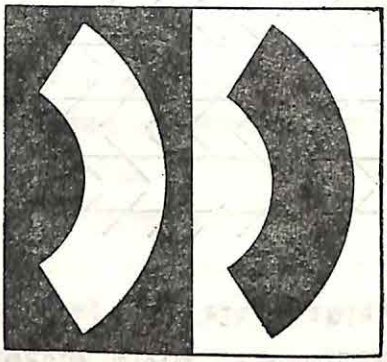


সাদা কাগজ থেকে সমান দৈর্ঘ্যের তিনটি ফালি কেটে নাও। এবার ঐ কাগজের একটা ফালিকে অপর দুটি ফালির অর্ধেক চওড়া করে কেটে

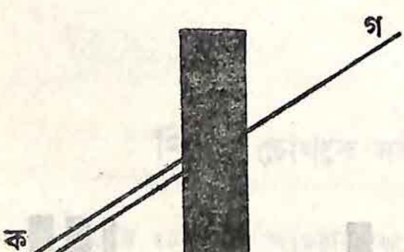
নাও। সরু ফালিটাকে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইরকম বিভিন্ন ভঙ্গীতে রাখলে দেখবে কখনও সেটা ছোট কিংবা বড় বা সমান দেখাচ্ছে!



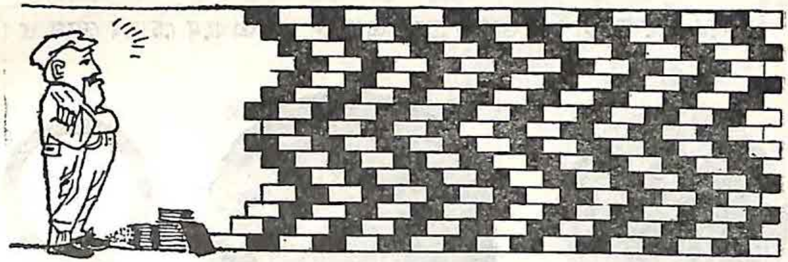
পাশের ছবির লাইন দুটো বাঁকা মনে হচ্ছে, তাই না? আসলে ওরা সমান্তরাল—কিন্তু চোখের ধাঁধায় ওইরকম মনে হচ্ছে।



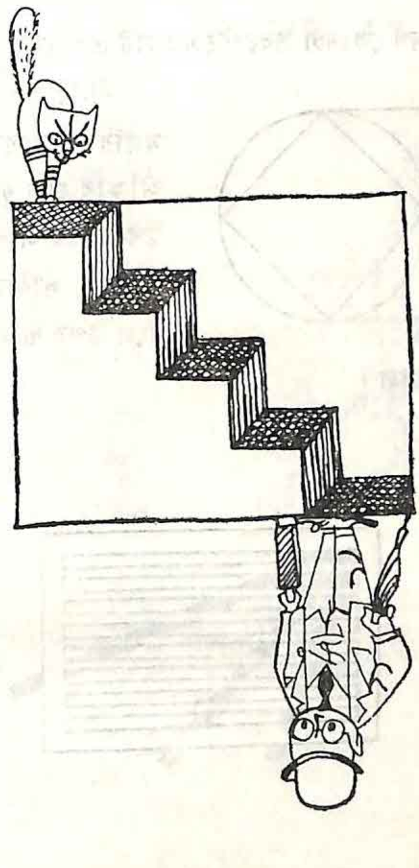
আবার দেখ, কালো রং দেওয়া বৃত্তের কোনও অংশের পিছনের পর্দা সাদা থাকলে সেটা তাদের রং পালটে দিলে (পাশের ছবি দেখ) ছোট দেখাবে, অন্যটাকে দেখাবে বড়। একবার মেপে দেখবে নাকি? সাদা থেকে কালো রং-এ হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে তোমার চোখ ঠকে যেতে পারে। ক গ সরলরেখার দিকে একবার তাকাও। আবার ঠকলে তুমি। আসলে সরলরেখাটি হচ্ছে খ গ।



পরপৃষ্ঠার ছবিটা দেখ। কি মনে হচ্ছে তোমার বল তো? তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ মিস্ত্রি একেবারে খামখেয়ালীর মতো কাজ করেছে—তাই না? আসলে হাল্কা এবং গাঢ় রংয়ের ইঁট পর পর সাজানোর ফলে এইরকম দেখাচ্ছে। কিন্তু রাজমিস্ত্রির দোষ দিয়ে লাভ নেই—সে ঠিক মাপমতো কাজই করেছে, ভুল দেখছে তোমার চোখ। এ ঘটনাটিও ঘটছে অনুরূপ সাদা থেকে কালো রং-এ হঠাৎ দৃষ্টি পরিবর্তনের জন্য।

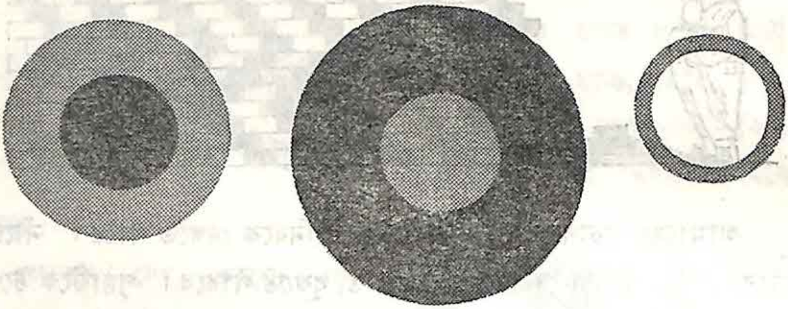


আমাদের চোখ দু'ভাবে কোনও জিনিষকে দেখতে পারে। নীচের আঁকা সিঁড়ির ছবিটা দেখলেই তোমরা তা বুঝতে পারবে। পৃষ্ঠাটিকে উল্টে

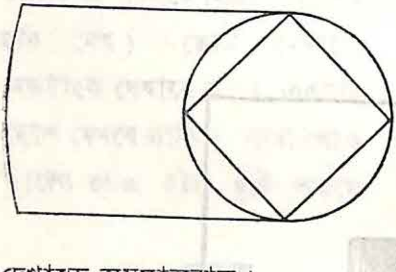


ধরলেই ঐ সিঁড়িটা তোমরা আবার দেখতে পাবে অন্যভাবে।

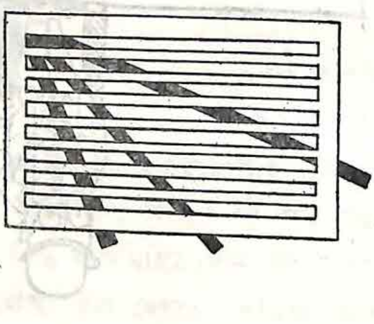
তিনটে বৃত্তের ছবি দেওয়া হয়েছে এখানে। প্রথমে চোখে দেখে এবং



পরে মাপ নিয়ে দেখ কোন্‌টা সবচাইতে ছোট এবং কোন্‌টা সবচাইতে বড়।



বাঁ-দিকের ছকটা কিন্তু ভারী মজার। বৃত্তের মধ্যে চতুর্ভুজটা আঁকার জন্য বৃত্তটাকে মনে হচ্ছে ঠিক ভাবে আঁকা হয়নি। আর পাশের লাইনটা একটু বেঁকানো বলে উপর ও নীচের লাইনটাকে দেখাচ্ছে অসমান্তরাল।



হাতে তৈরী মাইক্রোস্কোপ

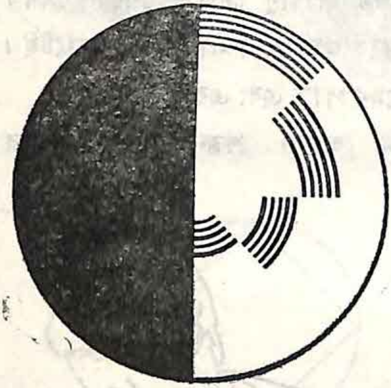
মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেছিলেন কে বল তো? লিউএন হুক নামে একজন বিখ্যাত ডাচম্যান। সম্ভবতঃ নিজের তৈরী মাইক্রোস্কোপের সাহায্যেই তিনি প্রথম জীবাণু দেখতে পেয়েছিলেন। আমরা যে মাইক্রোস্কোপ তৈরী করব তার জন্য লেন্স লাগবে না মোটেই। আমাদের চাই কিছুটা শক্ত এলুমিনিয়ামের পাত এবং একফোঁটা জল।

প্রথমে একখণ্ড পাতলা টিন অথবা শক্ত এলুমিনিয়ামের পাত থেকে একেবারে গোল করে খুব ছোট্ট একটা গর্ত কর। তারপর ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে ওটাকে রেখে খুব সাবধানে রংয়ের তুলি অথবা ড্রপার থেকে এক ফোঁটা জল ঐ গর্তে ফেল। দেখবে কেমন সুন্দর একটা লেন্সের মতো জলের ফোঁটা ওখানে আটকে রয়েছে। একটা বড় পিঁপড়ে অথবা কোনও পোকাকে তোমার তৈরী মাইক্রোসকোপের নীচে রেখে দেখ। কি বড় দেখাচ্ছে ওটা—তাই না?



বিজ্ঞান যার ব্যাখ্যা জানে না

উনবিংশ শতকের বিখ্যাত জার্মান পদার্থবিদ্ গুস্তাভ ফেচনার একটা মজার জিনিষ তৈরী করেছিলেন। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক সেইরকম একটা সাদা কাগজে এঁকে নিয়ে পাতলা পিচ বোর্ডের গায়ে আটকে দাও। পিচবোর্ডটাকে গোল করে মাপ মতো কেটে নিতে হবে। এইবার একটা আলপিন অথবা ড্রইং পিন ওর কেন্দ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে ওটাকে খুব জোরে ঘুরিয়ে বৃত্তগুলির দিকে তাকাও।



কি, নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছ, রঙীন হয়ে উঠল এটা কেমন করে? আচ্ছা এবার উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেখ তো কি হয়! রংগুলোও সব উল্টে ঘুরতে শুরু করল—তাই না! কেন এমন হয় বল তো, যার ফলে আমাদের চোখে বৃত্তগুলো রঙীন হয়ে ওঠে? সত্যি কথা বলতে কি, বিজ্ঞান এর ব্যাখ্যা জানে না। তোমরা বড় হয়ে চেষ্টা করে দেখো যদি এর একটা উত্তর দিতে পার।



এক্সপেরিমেণ্টের মজা

পদার্থবিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্ট করে কাউকে বোকা বানাতে চাও? অবশ্য অত্যন্ত গোবেচারীর মতো ভাব করে পরে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে ব্যাপারটা সহজেই মিটমাট হয়ে যাবে। এসো আমরা সেইরকম একটা এক্স-পেরিমেণ্টের মজা করি।



প্লাসটিকের একটা ছোট বোতল নাও। ওটার তলায় পেরেক দিয়ে অনেকগুলো ছিদ্র কর। একটা সাঁড়াশিতে পেরেকের মাথা আটকে নিয়ে—পেরেক-টাকে আগুনে গরম করে কৌটার পিছনে ঢুকালেও চট্ করে ওটা ফুটো করা চলবে। এইবার এক বালতি জলে কৌটোটা ডুবিয়ে ওটাকে জলভর্তি করে একটা শোলার ছিপি জলের মধ্যেই ওর মুখে আটকে দাও। ছিপিটা যেন কৌটোর মুখে ভালভাবে ফিট্ করে। কৌটোটাকে জল থেকে তুলে আনবার পর দেখবে, অবাক কাণ্ড, ওর নীচের ফুটো দিয়ে জল বেরুচ্ছে না মোটেই!

এইবার বুদ্ধি করে তোমার কোনও বন্ধুকে ঐ কৌটা দিয়ে ওর ছিপিটা

খুলতে বল। ভাবটা এমন করবে যেন তুমি ছিপিটা খোলবার জন্য কতই চেষ্টা করেছ কিন্তু কিছুতেই খুলতে পারনি। স্বভাবতই তোমার অনুরোধে ওই বন্ধু ওস্তাদি করে ছিপিটাকে খুলতে যাবে এবং তখনই মজাটা টের পাবে। কি হবে বল তো?—কি আবার! ঐ ছিপিটা খোলা মাত্র কৌটোর নীচ দিয়ে সব জলটুকু পড়ে যাবে। তোমার বন্ধুটি ভিজে যেতেও পারে। সাবধান, ব্যাপারটা বুদ্ধি করে সামলে নেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু তোমার!

এর কারণ কি বল তো? কৌটোটার নীচে যদিও ফুটো ছিল তবু যতক্ষণ তার মুখ ছিপি দিয়ে বন্ধ থাকবে ততক্ষণ এক ফোঁটা জলও পড়বে না। বাতাসের চাপ—এটা প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে প্রায় ১৪ পাউণ্ড করে চাপ দিচ্ছে কৌটোর নীচের ফুটোয়। কিন্তু যেইমাত্র তুমি তার উপরের ছিপিটা খুলে দেবে অমনি তলাকার বাতাসের চাপটা বাতিল হয়ে গিয়ে নীচ দিয়ে জল পড়তে থাকবে। ভারী মজার ব্যাপার এটা। তাই না?

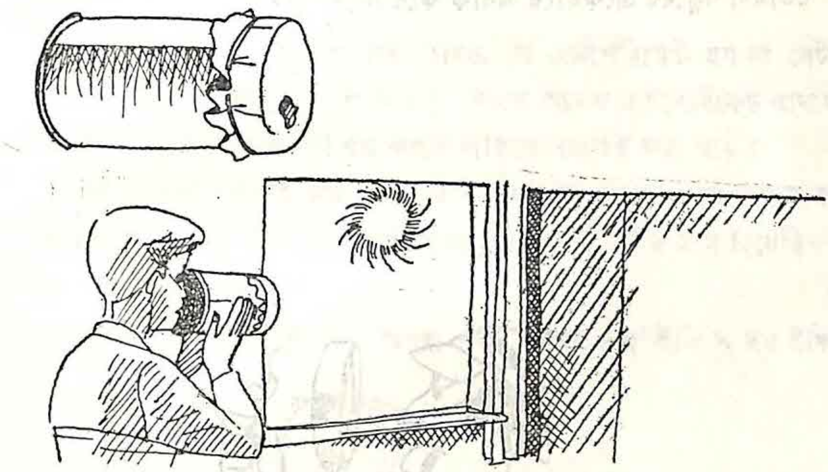
শব্দ দেখা

শব্দ-দেখা নামটা শুনে তোমরা নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ? এই লেখাটা লিখবার সময় বাবুন তো আমায় বলেই ফেলল—না মামা, ভূত দেখেছি রাত্তিরে অনেকদিন। কিন্তু শব্দ দেখিনি কোনদিন।

কিন্তু বললে বিশ্বাস করবে কিনা তা জানি না—বড় বড় মেশিনের শব্দই হোক অথবা ঘড়ির মৃদু আওয়াজই হোক, বা জটিল বৈদ্যুতিক কম্পন, সব কিছুই যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়—তার নাম 'ক্যাথোড রে অসিলোগ্রাফ'। অতি সূক্ষ্ম শব্দ কম্পন অথবা বৈদ্যুতিক কম্পন একেবারে সঠিক ভাবে এই যন্ত্রটির সাহায্যে পরিমাপ করা যায়।

'অসিলোগ্রাফ' হচ্ছে খুবই দামী এবং জটিল যন্ত্র। সব সময় ওটা

হাতের কাছে পাওয়াও যায় না। তাই আমরা এমন একটা মজার যন্ত্র তৈরী করব—যার সাহায্যে খুব সহজেই আমরা শব্দ-কম্পনকে দেখতে পারি। এর জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন নেই। একটা দু'মুখ খোলা



টিনের কৌটোর একদিকে রবারের বেলুনের কিছু অংশ ছবিতে যেমন ভাবে দেখানো হয়েছে সেইভাবে একটা রবার গার্ডার দিয়ে আটকে দাও। এবার ভাঙা কোনও আয়নার ছোট্ট একটা কাচ (ছবি দেখ) আঠা দিয়ে ঐ বেলুনের উপর আটকাতে হবে। ভাঙা আয়নার টুকরোটাকে একেবারে মাঝখানে আটকাবার দরকার নেই। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইরকম একপাশে লাগালেই চলবে।

তোমার 'অসিলোগ্রাফ' তো তৈরী হল। এবার ওটাকে সূর্যালোকে নাও। রোদ্দুর আসছে এমন জানালার কাছে গিয়েও দাঁড়াতে পার। এবার অসিলোগ্রাফ যন্ত্রটিকে এমন ভাবে সূর্যের দিকে তুলে ধর যেন আয়না থেকে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে দেওয়ালে পড়তে পারে। তুমি দেওয়ালে ছোট্ট একবিন্দু রশ্মি দেখতে পাবে। এবার ঐ কৌটোর ভিতর

দিয়ে যত জোরে খুশী শব্দ করতে থাক—ও ও ও ও ও…আ আ আ আ আ …ই ই ই ই ই…উ উ উ উ উ। ছোট্ট আয়নাটা কাঁপতে থাকবে এবং বিভিন্ন শব্দের জন্য দেওয়ালে ঐ সূর্যরশ্মিটা বিভিন্ন রূপে শব্দের ছবি হয়ে দেখা দেবে। এই 'অসিলোগ্রাফ' তৈরী করে শব্দ-কম্পন দেখিয়ে তোমরা বন্ধুদের একেবারে অবাক করে দিতে পার।

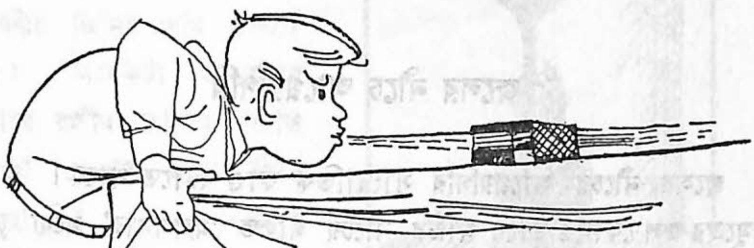


যে এক্সপেরিমেণ্ট হয় না

তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাবছ, যে এক্সপেরিমেণ্ট হয় না সেটা আবার এক্সপেরিমেণ্ট হোল কি করে ? অবশ্য অনেক এক্সপেরিমেণ্ট প্রথমে হতে চায় না, তবে কায়দাটা রপ্ত করতে পারলে সহজেই করা যায়।

এই এক্সপেরিমেণ্টের মজা এই যে—তুমি এটা করতে গেলে দেখবে যা ভেবেছিলে এখানে ঠিক তার উল্টো হয়েছে। তাই এটার নাম দিয়েছি—'যে এক্সপেরিমেণ্ট হয় না'।

একটা পাতলা কার্ডবোর্ড অথবা শক্ত কাগজ—তু' ইঞ্চি × ছয় ইঞ্চি



মাপের নাও। এবার ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে ওর তু' পাশ মুড়ে নিয়ে একটা ছোট্ট ব্রীজের মতন তৈরী কর। একটা টেবিলের উপর ওটাকে রেখে দাও। তারপর ছেলেটি যে ভাবে ব্রীজের তলা দিয়ে ফুঁ দিচ্ছে ঠিক সেইভাবে যত জোরে পার ফুঁ দাও। দেখবে একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যত জোরেই তুমি ফুঁ দাও না কেন, ঐ ব্রীজকে এতটুকু পিছনে সরাতে পারবে না। টেবিলের উপরটা খুব মসৃণ হলেও নয়। আবার মজা এই যে তোমার ফুঁয়ের জোর যত বেশী হবে ঐ ব্রীজটা টেবিলের গায়ে আটকেও যাবে তত জোরে। যদি তুমি ব্রীজের শেষ দিক থেকে ফুঁ দাও তাহলে অবশ্য ওটাকে কিছুদূর সরানো অসম্ভব নয়। সামান্য একটা

কাগজের টুকরো কেমন শক্ত ভাবে আঠার মতো টেবিলের গায়ে আটকে রয়েছে—এই অদ্ভুত ব্যাপারটা কেমন করে সম্ভব হচ্ছে বলতে পার ?

আসলে এটা ভোজবাজি বা অবিশ্বাস্য কোনও ব্যাপার-স্যাপার নয়। প্রকৃতির নিয়মেই ওই কাগজের ব্রীজটা সরতে পারছে না। আজ থেকে প্রায় দু'শো বছর আগে সুইশ বিজ্ঞানী ডানিয়েল বারনৌলি আবিষ্কার করেছিলেন যে বাতাস অথবা তরল পদার্থের প্রবাহের গতিবেগ বাড়লে তার চাপ কমবে। তুমি যখন জোরে ফুঁ দিচ্ছ তখন ব্রীজের নীচের বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যাওয়ায় তার চাপ কমে যাচ্ছে, ব্রীজের উপরকার বাতাসের তুলনায়। কাজেই উপরকার বাতাসের চাপে কাগজের ব্রীজটা যে সহজেই টেবিলের গায়ে আটকে থাকবে তাতে আর বিচিত্র কি !

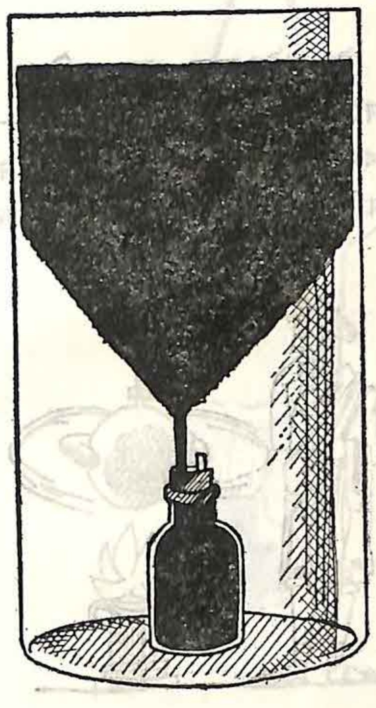
জলের নীচে আগ্নেয়গিরি

জলের নীচের আগ্নেয়গিরি সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটাতে পারে। কারণ সমুদ্রের জল কোনও ভাবে মাটির নীচের গলিত 'ম্যাগমার' মধ্যে ঢুকে পড়লে সেখানে হঠাৎ প্রচুর স্টীমের উৎপত্তি হয়। ওই স্টীম চারিদিক তোলপাড় করে ধারেকাছের দ্বীপ অথবা ডাঙায় বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে।

আমরা জলের নীচে ছোট্ট অথচ সুন্দর যে আগ্নেয়গিরি তৈরী করতে যাচ্ছি তাতে অবশ্য আগুনের ভয় নেই এবং এটা কোনও বিপত্তিও ঘটাবে না সহজে।

একটা ছোট্ট কালির দোয়াতের মুখে ছিপি লাগিয়ে ঐ ছিপিতে দুটো ফুটো কর। প্রথম ফুটোর মধ্যে দিয়ে একটা সাধারণ কাচের টিউব দোয়াতের নীচ পর্যন্ত চালিয়ে দাও। অপর ফুটোটা দিয়ে একটা ছোট কাচের টিউব (যার সামনের দিকটা ছুঁচলো করা হয়েছে) পুরে দাও। মুখ

ছুঁচলোওয়ালা কাচের টিউব পাওয়া না গেলে চোখের ওষুধের ড্রপার লাগিয়েও কাজ চালাতে পার। ছবিটা দেখলেই অবশ্য তোমাদের খানিকটা ধারণা হবে। এবার ঐ দোয়াতটাকে গরম জলে ভর্তি করে তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা কালি ঢেলে দাও।



যে কোনও রংয়ের কালি হলেই চলবে। ছোট এবং বড় টিউব সমেত ঐ ছিপিটাকে দোয়াতের মুখে ভাল করে বসিয়ে দাও। এবার একটা বড় কাচের জার অথবা বড় বোতলের মধ্যে ঠাণ্ডা জল নিয়ে দোয়াতটাকে ওর নীচে বসিয়ে দাও। এবার একটা আকর্ষণীয় জিনিষ তুমি দেখতে পাবে। অনেকটা ফানেলের আকারে রঙ্গীন কালির স্রোত ড্রপারের জেটের মধ্যে দিয়ে আগ্নেয়গিরির মতো বেরিয়ে আসবে। দোয়াতের মধ্যেকার গরম জলকে বোতলের ঠাণ্ডা জল সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত রঙ্গীন আগ্নেয়গিরির স্রোত দেখতে পাবে।

এই এক্সপেরিমেন্টের ব্যাখ্যাও খুব সাধারণ। গরম জল ঠাণ্ডা জলের চাইতে হাল্কা; তাই সহজেই ওই গরম জল উপরের দিকে উঠে যায়—যেমন হাইড্রোজেন গ্যাসযুক্ত বেলুন বাতাসের উপরে ভেসে থাকে, ঠিক তেমনি। আবার ঠাণ্ডা জল ভারী বলে দোয়াতের মধ্যে ঢুকতে থাকে। এই ঘটনা ততক্ষণই চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত দোয়াতের জলের তাপমাত্রা বোতলের জলের সমান না হবে।

স্টীম টারবাইন

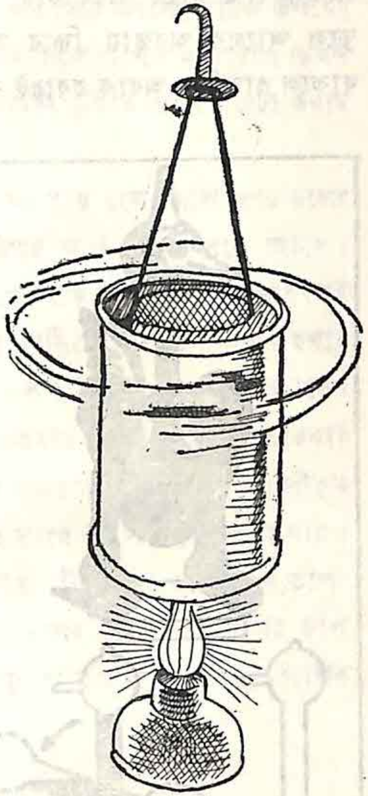
টারবাইন হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র যেটা বাষ্পের সাহায্যে সহজেই ঘুরতে পারে। প্রায় দু'হাজার বছর আগে—যখন দাসপ্রথার প্রবল প্রচলন ছিল, তখন আলেকজান্দ্রিয়ার 'হিরো' নামে একজন লোক এই স্টীম-এঞ্জিন আবিষ্কার করেন। একটা ধাতুর তৈরী বলের দু'দিকে ছোট দুটো বেঁকানো



পাইপ ছিল। ঐ ধাতুর তৈরী বলের মধ্যে জল নিয়ে গরম করা হত। পাইপ দিয়ে স্টীম বেরুবার সাথে সাথে ঐ বল উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করত। এই স্টীম-এঞ্জিনটা দিয়ে অবশ্য কোনও কাজ করান হত না। কেবলমাত্র মজা দেখার জন্যেই ওটাকে ব্যবহার করা হত। অবশ্য বাষ্প-শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনও তখন দেখা দেয়নি মোটেই। কেন বলতে পার? আসলে মেহনতি মানুষের শক্তিকে দাস হিসাবে তখন খুব সস্তায় কাজে লাগান যেত। তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে কাজে লাগানোর ব্যাপারটা কারো মাথায় তখন খেলেনি।

গ্রীকদের মতন ওইরকম একটা স্টীম টারবাইন আমরা খুব সহজেই তৈরী করতে পারি। একটা টিনের ঢাকনা শুদ্ধ কৌটো নাও। কৌটোর উপরে দু'পাশে পেরেক দিয়ে খুব ছোট দুটো ফুটো ($\frac{1}{10}$ ইঞ্চি) করতে হবে। ফুটো দুটো এমন কায়দা করে করবে যেন স্টীম

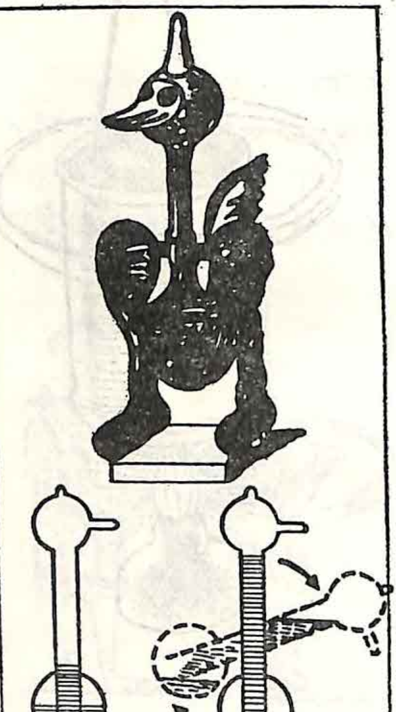
বেরুবার সময় সোজাসুজি না বেরিয়ে ঐ টিনের কৌটোর কোনাকুনি ভাবে বেরুতে পারে। পেরেকটাকে কৌটোর মধ্যে ঢুকাবার পর যতটা সম্ভব বেঁকিয়ে নিলেই যে রকম ফুটোর কথা বলছি তা করতে পারবে। এবার টিনের কৌটোকে উপর থেকে রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে আটকে ঝুলিয়ে দাও। আগে থেকে কিছুটা ফুটন্ত গরম জল ঐ টিনের মধ্যে দিয়ে নিলে সুবিধা হবে। এবার নীচে থেকে স্পিরিট-ল্যাম্প অথবা মোমবাতির সাহায্যে কৌটোটা-কে গরম করলে দেখবে যেদিক দিয়ে স্টীম বেরুচ্ছে তার ঠিক উল্টোদিকে কৌটোটা ঠিক টার-বাইনের মতো চমৎকার ঘুরতে আরম্ভ করেছে।



খেলনা পাখীর জল খাওয়া

ছোট্ট একটা খেলনা-পাখী তার নিজের খেয়ালখুশী মতো ঠোঁট ডুবিয়ে জল খাচ্ছে, আবার জল খাওয়া শেষ হলে নিজের থেকেই মুখ তুলে নিচ্ছে—ব্যাপারটা খুব মজার, নয় কি? কোথাও কিছু নেই, অথচ এই

খেলনা-পাখী বারে বারে তার নিজের ঠোঁট জলে ডুবাবে, আবার মুখটা তুলে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। এই প্রক্রিয়া অনবরত চলতে থাকলে বাস্তবিক অবাক হবারই কথা!



এই খেলনা-পাখীর মাথা হচ্ছে একটা গোলক, দেহটা কাচের নলে তৈরী। আর নলের এই খোলা মুখটা ঢুকানো রয়েছে নীচের বড় একটা কাচের গোলকের ভিতর।

ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে তুলো দিয়ে তোমরা এই খেলনা-পাখীর ঠোঁট, চোখ ও মাথার টুপী তৈরী করতে পার। কাচের জিনিষ তৈরী করে এমন কারখানায় গিয়ে বললে তারা সহজেই তোমাদের এইরকম একটা পাখী বানিয়ে দেবে। খুব পাতলা প্লাইউড কেটে তার থেকে খেলনা-পাখীকে দাঁড় করাবার জন্য দুটো দেওয়াল তৈরী কর। এর তলায় একটা কাঠের পাটাতনও থাকবে।

কেন এই পাখী বারে বারে জলে তার ঠোঁট ডুবায় ও তুলে নেয় এবার তা বলছি। খেলনা-পাখীর নীচের বড় গোলক ও কাচ-নলের খোলা মুখের কিছুটা উপর পর্যন্ত ইথার দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। ইথার হচ্ছে অনেকটা জলের মতো দেখতে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রাবক। যেহেতু নীচের এই গোলক উপরটার চেয়ে ভারী তাই পাখীটা কিছুক্ষণের জন্য খাড়া অবস্থায়

দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর ঐ ইথার কাচের নল দিয়ে আস্তে আস্তে উপরের ছোট গোলকের দিকে উঠে আসে। সেই সঙ্গে পাখীর মাথাটাও ক্রমশ নীচু হয়ে যায় ও জলের মধ্যে সে তার ঠোঁটটা ডুবিয়ে দেয়। এটা করার সময় ওর মাথার তুলোটাও যায় ভিজে।

পাখীটা অনুভূমিক (Horizontal) অবস্থায় চলে এলে কাচ-নলের খোলা মুখটা বড় গোলকের ইথারের উপর অংশ থেকে সরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে কাচ-নলের ইথার নীচের বড় গোলকে চলে আসবে, আর সেই সাথে আমাদের খেলনা-পাখীও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ ইথার উপর-নীচ করে বলেই পাখীর মুখ জলের দিকে এগিয়ে যায় ও সরে আসে।

কিন্তু কেন ইথার ম্যাজিকের মতো একবার উপরে ওঠে আর একবার নীচে নামে বলতে পার? ইথার সাধারণ উষ্ণতায় খুব সহজেই বাষ্পীভূত হয়। ইথার-বাষ্পের এই চাপ তাপমাত্রার সাথে খুব সহজেই বদলে যায়। খেলনা-পাখীর মাথার গোলকের তাপমাত্রা নীচের বড় গোলকের তাপমাত্রার চেয়ে কম থাকে। আবার কাচ-নলের সম্পৃক্ত বাষ্পের চাপ কমে যাওয়ার জন্য ইথারের উপরে ওঠা ছাড়া আর অন্য পথ নেই! পাখীর মুখ এই জন্যেই উপর-নীচ করতে পারে।

